শ্রীগৌরাঙ্গ।

গ্রন্থকার প্রণীত

নদীয়া-কাহিনী

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত নূতন বৃহৎ সংস্করণ।

প্রাচীন ও আধুনিক নদীয়ার অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়

লিখিত মুখবন্ধ সংবলিত।

একাধারে উপন্যাস, ইতিহাস, সুখপাঠ্য সাহিত্য।

উৎকৃষ্ট কাগজ, সুন্দর বাঁধাই, মনোরম চিত্রাবলী।

সর্ব্বজন প্রশংসিত সুবৃহৎ পুস্তক।

সপারিষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাগবত শ্রবণ।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বের অঙ্কিত একখানি চিত্রপট হইতে গৃহীত, কুণ্ডঘাটা রাজবাটীতে সংরক্ষিত চিত্রের প্রতিলিপি।

শ্রীগৌরাঙ্গ

কলিপাবন, পতিত-তারণ, ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ
মহাপ্রভুর পূতলীলা-গ্রন্থ

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী
সিটীবুক সোসাইটী
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

সন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

মূল্য—আট আনা মাত্র।

যাহার স্ফটিক স্বচ্ছ

বিমল জীবনে

এই গ্রন্থ-বর্ণিত মহাপুরুষের

পূত চরিত্র

সর্ব্বদা প্রতিফলিত দেখিয়াছি

আমার সেই

ইহ জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা

পিতৃদেবের

মধুর পবিত্র স্মৃতিতে

নিবেদন

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন নদীয়া-কাহিনী পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করি, তখন তদঙ্গীভূত করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেবের এই জীবনীকথা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু নদীয়া-কাহিনীর কলেবর স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ হিতৈষী সাহিত্যগুরু, সর্ব্বজন-মান্য সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী ইহা হইতে কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া দিই। তদবধি মাথার উপর দিয়া কত শোক তাপের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, ইহা আর ছাপিবার অবসর পাই নাই, এত দিনে শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছায় ইহা প্রকাশিত হইল।

বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরাঙ্গলীলার কয়েকটী স্থূল কথামাত্র অতি সংক্ষেপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, নতুবা তাঁহার ঘটনাবহুল, প্রেমময় জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একটি সুদীর্ঘ জীবনেও উহা সম্পন্ন হইতে পারে কিনা, সন্দেহস্থল। মুক্তি ছার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন;—

"চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখান॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্যের যশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি কৃপা সবে তত গাই॥"

আজ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি সর্ব্বজনমান্য অমূল্য গ্রন্থরাজি-চিত্রিত আলেখ্যের অনুকরণেই চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, জানি না "সাচ্চ নকলে আসল খাস্তা হইয়াছে কি না?"

শ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংস পরমভাগবত, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেবচরিত্র বর্ণনে আমার অক্ষমতা দেখিয়া, কৃপা করিয়া এই পুস্তকের "ভূমিকা" লিখিয়া ইহার অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া দিয়াছেন, ইহার নিমিত্ত আমি চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণপাশে বদ্ধ রহিলাম। ভরসা করি, শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিতরণের যথার্থ অধিকারী ও নির্দ্দেশিত পরিবেষ্টা সিদ্ধবংশের ভাবুক লেখকের লেখনী-প্রসূত এই "ভূমিকা" ভক্তের প্রাণে ভাবোচ্ছ্বাস আনিয়া দিবে।

আমার প্রিয়সুহৃদ্ প্রথিতনামা যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁহার অঙ্কিত "গরুড় স্তম্ভের নিম্নে ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গদেব" নামক চিত্রখানির প্রতিরূপ এই পুস্তকে মুদ্রাঙ্কন করিতে সম্মতি দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। পুস্তকস্থ অন্যান্য চিত্রাবলী সংগ্রহের নিমিত্ত আমি আমার পরম স্নেহাস্পদ চিত্রশিল্পী শ্রীমান গিরিজানাথ দে চৌধুরী ও শ্রীমান অরুণচন্দ্র দে চৌধুরীর নিকট ঋণী। "পুরীপথে শ্রীচৈতন্যদেবের দ্রুতগমন" চিত্রখানি আমি "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" লেখক সাহিত্যানুরাগী, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি ইঁহাদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অক্ষম হইয়াও শ্রীচৈতন্যচরিত লিখিতে যাওয়া প্রগল্‌ভতা জানি, কিন্তু লোভ বড় দুর্দ্দমনীয় রিপু, আমি কর্ম্মময় সংসারে শান্তির লোভেই এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; দেবচরিত্র যথাযথ বর্ণনা করিতে না পারিলে জনসমাজে লজ্জা পাইতে হইবে, একথা চিন্তা করিবারও অবসর

পাই নাই, প্রাণের আবেগে যেমন তেমন করিয়া ইহা সম্পন্ন করিয়াছি মাত্র ; তবে ভরসা আছে, শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার ভক্তগণও ভাবগ্রাহী, ভাষা বা পদলালিত্যের তাঁহাদের নিকট কোনও মর্য্যাদাই নাই। কি ছার আমার এই বিফল আয়াস! ভক্তরাজ সুকবি শ্রীবৃন্দাবন দাস কবিরাজ গোস্বামী সুধামাখা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াও তৃপ্তি না পাইয়া লিখিয়াছিলেন ;—

"অনন্ত চৈতন্যকথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥"

আমিও লোভের দায়ে লজ্জার মাথা খাইয়া যথাশক্তি টানাটানি করিয়াছি বটে, কিন্তু অক্ষমতা বশতঃ সে দেবলীলা যথাযথ বর্ণনা করিতে সমর্থ হই নাই, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র-মাধুর্য্যে সুধী পাঠক ইহার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

রাণাঘাট
ভাদ্র, শুক্লৈকাদশী
১৩১৮।

শ্রীগৌরগণানুগত সেবক
শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

ভূমিকা

১৪০৭ শকের শুভ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীর মত পবিত্র তিথি গৌড়বাসীর ভাগ্যে আর ঘটে নাই। ঐ সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণা পূর্ণিমায় আমাদের কালিমাহীন চৈতন্য-চন্দ্রমা প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রেমামৃত বিতরণে পৃথিবীর পাপ তাপ অপহরণ করেন।

৪৮ বৎসর মাত্র প্রকট রহিয়া তিনি যে অলৌকিক লীলা করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধি তাহা সহৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে,—ভক্তের আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেল করিয়া দিতেছে এবং অতি বড় অবিশ্বাসীর অন্ধতমসাবৃত অন্তরও বিশ্বাসের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে।

তাঁহার লোকপাবনী লীলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, দেখিবে, রূপে তিনি কন্দর্প-জয়ী,—বিদ্যায় তিনি দিগ্বিজয়ী জয়ী,—বৈরাগ্যে তিনি বিশ্ববিজয়ী,—এবং প্রেমভক্তি বিতরণে সর্ব্বাবতারপরাজয়ী, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ। বাঙ্গালিজাতির বিশেষ ভাগ্য যে, এমন মহিমাময় মহাপ্রভু তাঁহাদের দেশে ও তাঁহাদের জাতিতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরলীলার বিশেষত্ব এই,—তাহার অন্তর বাহির সৎশিক্ষায় পরিপূর্ণ এবং বিনয়ের বিমোহন বীণা-ঝঙ্কারে তাহা মুখরিত। যে ভাগ্যবান, তাহা আস্বাদনের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই লীলাময়ের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রেমের ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়া ত্রিতাপ-তপ্ত জীবন সুশীতল করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাভাজন,তাঁহারা কখন স্বার্থপর কামনা-কিঙ্করের মত একা একা কোন সামগ্রী উপভোগ করিতে ভাল বাসেন না;

পাঁচ জনকে বিতরণ করিয়া উপভোগ করিতেই আনন্দ অনুভব করেন। আমাদের পরম শুভাশীর্ব্বাদভাজন শ্রীমান কুমুদনাথ মল্লিক ভাইজীবন ভক্তবংশে জাত এবং নিজেও একজন অকপট ভক্ত, তাই তিনি এই গৌর-লীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য্য একা একা উপভোগ করিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই, আর পাঁচ জনকেও এই মাধুর্য্য আস্বাদনের অধিকারী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থ "শ্রীগৌরাঙ্গ" তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীবিগ্রহের নানা বেশভূষায় বিভূষিত শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া অনেকে আনন্দ অনুভব করেন, আবার কেহ বা শ্রীবিগ্রহের "ওলাইবেশ", অর্থাৎ ভূষণশূন্য সামান্য বস্ত্র ও উত্তরীয় মাত্র যুক্ত বেশ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। অলঙ্কারের আতিশয্যে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, তাই এই ওলাই বেশের উপর প্রীতিপ্রকাশ। শ্রীমান কুমুদনাথের শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিয়া আমার সেই ওলাই বেশের কথাই প্রাণে জাগিয়া উঠে। যাঁহারা আড়ম্বরহীন, অতিরঞ্জনহীন শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে চান, তাঁহারা শ্রীমানের শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখুন, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবে। শুধু তাহাই নহে, আজিকালিকার অনেক ভেকধারী ভণ্ডদের আচরণ দেখিয়া কিম্বা তাহাদের স্বকপোলকল্পিত কুৎসিৎ কথা শুনিয়া যাঁহারা মনে করেন, ইহাই বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম, তাঁহাদের সে সংস্কারও সমূলে উন্মূলিত হইবে।

শ্রীমান কুমুদনাথ এই পরম মধুর লীলাগ্রন্থ প্রচার করিয়া ধন্য হইলেন, আমিও ইহার ভূমিকা লিখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম, এখন পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া ধন্য হউন। ইতি

৪০ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
কলিকাতা।
ভাদ্র ১৩১৮

শ্রীগৌরাঙ্গ দাসানুদাস
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

সূচিপত্র।

—:০:—

চিত্রাবলী।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

আদি লীলা।

ভুবনৈকনাথ, সর্ব্বজনপূজ্য, হরিনামমূর্ত্তি, শচীদুলাল শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবে জ্ঞান গৌরবান্বিতা নদীয়া যে সমধিক গৌরবান্বিতা হইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সুরভিকুসুম চন্দন-লিপ্ত হইলে যেমন অধিকতর মনোহারী হয়, কিম্বা পূতঃ সলিলা ভাগীরথী পূণ্য তিথি প্রাপ্ত হইলে যেমন সমধিক মহিমান্বিতা হয়েন, অথবা সুবর্ণ মণিমাণিক্যখচিত হইলে তাহার শোভা যেমন শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, বাণীর পীঠস্থান জ্ঞানগৌরবসম্পন্না নবদ্বীপ প্রেমভক্তির জীবন্তমূর্ত্তি মহাপ্রভুর পবিত্র পদস্পর্শে ততোধিক মহিমান্বিতা হইয়াছে।

মহাপ্রভুর জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ তান্ত্রিক আচার ব্যবহারে প্লাবিত হইয়াছিল। "পঞ্চ মকারের" সাধনায় বঙ্গদেশ তখন বিভোর। সোমরস পান, অকারণ পশু হনন, দেবদ্বিজে অভক্তি প্রভৃতি তখন সংক্রামকরূপে বঙ্গদেশ গ্রাস করিতে বসিয়াছিল। এই নীরস, ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ড দুই একজন সাত্ত্বিকভাবসম্পন্ন ব্যক্তির মনে দারুণ ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠে এবং তাঁহারা আকুলপ্রাণে সকলকে "জীবে দয়া," ও "নামে রুচি"

শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুই প্রেমিক অমর কবি আপনাদের "কোমল কান্ত পদাবলী" রচনা দ্বারা বঙ্গদেশে যে প্রেমের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বহুবর্ষ পরে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে লাভ করিয়াছি। সিদ্ধ পুরুষ চণ্ডীদাস যেন শতবর্ষ পূর্ব্বে মানসচক্ষে সুন্দরাতিসুন্দর চৈতন্যদেবকে দেখিতে পাইয়াই কলকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

"আজু কে গো মুরলি বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল ॥"
"চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ বা হবে কোন দেশে ॥"

ভক্ত চণ্ডীদাস শতবর্ষ পূর্ব্বে যে মহাপুরুষের ভাবী আবির্ভাবের আভাষ মাত্র দিয়াছিলেন, শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কলির প্রারম্ভে পুরাণকারগণও স্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

তদানীন্তন নবদ্বীপ।

শ্রীচৈতন্যের অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নদীয়ার রাজনৈতিক গগন ঘোর তমসাবৃত হয়, নদীয়া তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং পাঠান নরপতি মুজাফরশা গৌড়-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কুলোকের কুপরামর্শে হিন্দুগণের উপর, বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও তৎ-

* শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে, সে গুলি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে যথাযথ উদ্ধৃত হইল। সে গুলির যথার্থতা-বিচারের ভার পাঠকের প্রতি অর্পিত হইল।

সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহের হিন্দু অধিবাসিগণের উপর পরম অত্যাচারী হইয়া উঠেন। জয়ানন্দ তাঁহার সেই সময়ে রচিত চৈতন্যমঙ্গলে এই সময়ের একখানি নিখুঁত ছবি দিয়াছেন। তিনি সে সময়ের অবস্থা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর দ্বার লোটে তারে নাগপাশে বাঁধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমা করিবে প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥

এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥"

এইরূপে নদীয়া উচ্ছন্ন করিবার রাজাদেশ পাইয়া মুসলমানগণ নদীয়া ধ্বংস করিতে সাগ্রহে প্রস্তুত হইল এবং হিন্দুগণের জাতি প্রাণ নাশ করিতে লাগিল। কিন্তু এ অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, মুজাফরের মন্ত্রী হুসেন সাহ মুজাফরের প্রাণনাশ করিয়া ১৪৯৬ অব্দে স্বয়ং গৌড়সিংহাসন অধিকার করেন এবং রাজা হইয়া নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির, ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃ সংস্কারের অনুমতি প্রদান করেন। এই সময় নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় বিস্তীর্ণ ছিল। মায়াপুর, বামন পুখুরিয়া, হাটডাঙ্গা, চোঁপাহাস, শিমুলিয়া, মাউগাছি, রাতুপুর, বেলপুখুরিয়া, মাজিতাগ্রাম, আতোপুর, বিদ্যানগর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল; এতদ্ব্যতীত চৈতন্য ভাগবতে শঙ্খবণিকের নগর, কাংস বণিকের নগর, গন্ধ বণিকের নগর, মালাকরপল্লী, তন্তুবায়পল্লী প্রভৃতি বহুপল্লীর উল্লেখ দেখা যায়। নরহরি দাস তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তদানীন্তন নবদ্বীপকে অষ্টক্রোশ ব্যাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবতে তখনকার নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য এইরূপে বর্ণিত আছে:—

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক বলি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥"

এতদ্দ্বারা, নবদ্বীপে সে সময়ে বিদ্যাচর্চ্চার কি প্রকার প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার বেশ আভাষ পাওয়া যায়। সমগ্র নবদ্বীপ তখন ভক্তিশূন্য জ্ঞানস্পৃহায় মত্ত হইয়া এক বিরাট পাঠশালায় পরিণত হইয়াছিল। অন্যান্য পাঠের মধ্যে নবদ্বীপে ন্যায়ের চর্চ্চাই তখন বিশেষ রূপে চলিতেছিল। যে তর্কবহুল শাস্ত্র শতবার ভগবানকে স্থাপনা করিতেছে ও সহস্রবার প্রমাণাভাবে তাঁহার অস্তিত্ব খণ্ডন করিতেছে, সেই শুষ্ক ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন তখন নদীয়ার অস্থি মজ্জা ও শোণিতে প্রবেশ করিয়াছে। তখন সহজ কথায় কেহ আর কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতেন না। প্রমাণ, যুক্তি ও তর্ক দ্বারা মামাংসিত না হইলে কোন বিষয়ই সুসিদ্ধ হইত না। বিদ্যা, বিদ্যা করিয়া তখন সমগ্র নবদ্বীপ নগর একেবারে উন্মত্ত। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যাচর্চ্চাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই সার্ব্বজনীন বিদ্যোন্মাদের সম্মুখে তখন পার্থিব ও অপার্থিব আর সমস্ত বিষয় লুপ্ত হইতেছিল ; এমন কি মোহময় সংসার পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইতেছিল। পুরুষের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোক-গণও বিদ্বান স্বামী, বিদ্বান পুত্র, বিদ্বান ভ্রাতা, বিদ্বান জামাতার গৌরবে গৌরবান্বিতা হইতেন। এইরূপে সহস্র সহস্র লোক সর্ব্বদা বিদ্যাচর্চ্চায় রত হওয়ায় নবদ্বীপের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্য নগর হইতে পৃথক হইয়া গেল। বিদ্যাচর্চ্চায় যদিও নদীয়া এইরূপে তখন সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ নরনারী সদাচার-ভ্রষ্ট ও ইতর সুখাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাস এইরূপ বলিয়াছেন :—

"বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নামতত্ত্ব
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।

কলিকাল সর্পবিষে দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে, ধুম ধাম করে সবে;
নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ।
যক্ষ পুজে মদ্য মাংসে নানা মতে জীব হিংসে
এই মত হ'ল সর্ব্বদেশ॥"

দেশের এই প্রকার ভক্তিশূন্য শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া নদীয়াবাসী জনকয়েক ভক্ত মহাপুরুষ অতিশয় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য। তাঁহার নিবাস শান্তিপুর, তিনি পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া কি উপায়ে এই দুর্দ্দশার বিমোচন হয়, কিসে আশুধ্বংসের কবল হইতে জগৎকে রক্ষা করা যায়, কিসে এই পাপ মোহের অবসান হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তনীয় হইল। তিনি বুঝিলেন, ভগবানের করুণাকণা ব্যতিরেকে এ দারুণ দুর্গতি দূরীভূত হইবে না। আকুলিত হৃদয়ে জীবের কল্যাণার্থ সেই পরদুঃখকাতর, মহর্ষি মহাতপে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার পূত হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা শীঘ্রই পরম পিতার মহাসিংহাসন-সন্নিধানে উপনীত হইল, এবং ভক্তাধীন ভগবান, ব্যাকুল ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতের মহাকর্ষণে বিচলিত হইয়া কলির প্রভাব দমন ও জীবের দুঃখ দূর করিতেই যেন সপরিবার নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীহট্টে শ্রীবাস, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব, মুরারী গুপ্ত; বূঢ়নে হরিদাস; রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ; চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। যদিও বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সকল উজ্জ্বল মণি আবির্ভূত হইয়া দীপ্তি পাইতেছিলেন, তথাপি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর নবদ্বীপে ইঁহারা সকলে

মিলিত হন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে এ মিলন এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইল প্রভু সর্ব্ব পরিবারে॥
জন্ম লভিলেন সবে মনুষ্য ভিতরে।
কি অনন্ত, কি শিব, কি বিরিঞ্চি ঋষিগণে॥
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণে।
ভাগবত রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার॥
কার জন্ম নবদ্বীপে কার চাটিগ্রামে।
কারো রাঢ়ে উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।
নানাস্থানে অবতীর্ণ হইল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হইল সবার মিলন॥"

এই মিলন যমুনা জাহ্নবী ও স্বরস্বতীর পবিত্র মিলন অপেক্ষা সুন্দরতর, কারণ যমুনা যাঁর পদস্পর্শে পূতবারী, জাহ্নবী যাঁর পাদোদক, স্বরস্বতী যাঁর ইচ্ছাপ্রসূত, সেই শ্রীহরি এই মিলনের মুখপত্র, এ মিলনের পবিত্র প্রয়াগ নবদ্বীপ, ও পূণ্যময় ত্রিবেণী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

আবির্ভাব।

১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) যখন নবদ্বীপের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন ও মুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা অতিশয় ম্লান হইয়া আসিয়াছিল ও নবদ্বীপের অধ্যাত্ম আকাশ

ততোধিক তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখনই যবনের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া, ন্যায়াধ্যাপকের কূটতর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, জ্ঞানচর্চ্চার চরম ফলস্বরূপ, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ এবং সংসারকে জীবে দয়া শিখাইতে ও নামে প্রেম শিক্ষা দিতে শ্রীশ্রীশচীদুলাল আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের ভাগ্যবান পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, পুরন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল। তাঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে। তাঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থ বাণীর প্রিয় নিকেতন নবদ্বীপে আগমন করেন এবং পাঠ সমাপনান্তে নবদ্বীপবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা "শান্তমূর্ত্তি শচীদেবীর" পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের যে পল্লীতে শ্রীহট্টিয়গণ বাস করিতেন, সেই পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন।

শচীর গর্ভে জগন্নাথের পরপর আটটী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করেন, কিন্তু সকলেই অল্প বয়সে গতায়ু হয়েন। শিশু কন্যাগণের শোকে যখন ব্রাহ্মণদম্পতি ম্রিয়মাণ তখন তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আদর করিয়া এই রূপবান পুত্রের বিশ্বরূপ নাম রাখেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রাদিতে উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন হয়েন। বিশ্বরূপের ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্রীনিমাই জন্ম পরিগ্রহ করেন।

যে শুভ নিশিতে চৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেটী সুনির্ম্মল ফাল্গুনী পূর্ণিমা এবং যে শুভ মুহূর্ত্তে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েন, তখন চন্দ্র-গ্রহণ হইয়াছিল, সুতরাং সমগ্র হিন্দুস্থান তখন চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী দানধ্যানাদি সৎকর্ম্মে রত এবং মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীয়া মুখরিত। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এ সময়ের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল॥
সংকীর্ত্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে যাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কার।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদলোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥
হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥"

এইরূপে অনন্তকণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনির মধ্যে, "সিংহ রাশি, সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণে, ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ, সর্ব্বশুভক্ষণে জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপস্থ ভবনে, নিম্বমূলস্থ সূতিকাগৃহে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণ তৎকালোচিত প্রথানুযায়ী সূতিকাগারে হরিদ্রা ও সিন্দূরাদি প্রেরণ করেন। কথিত আছে, একদা অদ্বৈতাচার্য্য যখন গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন, তখন একটি তুলসী পত্রকে স্রোতের প্রতিকূলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যজ্ঞানে তিনি উক্ত পত্রের অনুসরণ করেন। উক্ত তুলসীপত্র ক্রমে উত্তরাভিমুখে নবদ্বীপের ঘাটে অবগাহমানা শচীদেবীর গর্ভ স্পর্শ করে। শচীদেবী তখন গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং ভক্তরাজ আচার্য্য এই অলৌকিক ব্যাপারে বুঝিতে পারেন যে, শচীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। তাই তিনি শান্তিপুর হইতে আসিয়া জগন্নাথ

মিশ্রের বাসভবনের নিকট স্বীয় আবাস নির্ম্মাণ করেন এবং শ্রীগৌ-রাঙ্গের ভূমিষ্ঠ হইবার কালে স্বীয় পত্নী সীতাদেবীকে সূতিকাগারে প্রেরণ করেন। অদ্বৈত-গৃহিণীই, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, তাঁহাকে ডাকিনী, পিশাচ, ও অপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে তাঁহার "নিমাই" নাম রাখেন। পরবর্ত্তী জীবনে অসংখ্য ভক্ত কর্ত্তৃক সহস্র নামে আখ্যাত হইলেও, সূতিকাগৃহের এই আদরের নাম তাঁহার প্রিয়জনে একদিনও ভুলে নাই। জগন্নাথ অন্নপ্রাশনকালে পুত্রের নাম রাখিলেন "বিশ্বম্ভর", উপনয়নকালে তাঁহার আর একটী নাম হইল "গৌরহরি," ভক্তগণ তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বশেষ নাম হইয়াছিল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

শৈশব।

শচীদুলাল পিতৃগৃহে শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। প্রথমে হাঁমাগুড়ি দিতে শিখিলেন, ক্রমে বয়ো-বৃদ্ধি সহকারে এক আধটু পাদচারণা শিক্ষা করিলেন এবং সর্ব্বদা মায়ের সহিত খেলা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যমঙ্গলে এই সময়ের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে থটি করে।
ক্ষণে কোলে, ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥
শচীমার স্তনযুগে দুই পা রাখিয়ে।
সোণার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে ॥"

এই অলৌকিক সুবর্ণলাঞ্ছিত, সুউজ্জ্বল বর্ণশালী, সুঠাম গঠন, ও মনোহর ভঙ্গিমাশালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপ্রাকৃত শিশুটী ঠিক অন্যান্য

শিশুর মত ছিল না। শিশু ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, সহস্র চেষ্টা, সহস্র যত্ন বিফল হইয়া যাইতেছে, তখন একবার হরিধ্বনি কর, শিশু অমনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে, মায়ের ক্রোড়ে স্থির হইয়া রহিবে। যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

"করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন।
এতদার্থে করে প্রভু শয়নে রোদন॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন॥
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্র বদনে॥
জানিয়ে প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মিলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি॥
আনন্দে করয়ে সবে হরি সংকীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হইল শচীর ভবন॥"

নিমায়ের আর একটী অপ্রাকৃত গুণ এই ছিল যে, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলে শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। স্পর্শে আনন্দ ত হইতেই পারে তাঁহাকে দর্শন করিলেও প্রাণ আনন্দে বিভোর হইত। শতবার সহস্রবার দেখিলেও দেখার সাধ কিছুতেই মিটিত না।

এই সময়ে শচীমাতা ও পিতা জগন্নাথ সর্ব্বদা নানা অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন :—

"এক দিন ডাক দিয়া বলে মিশ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥
বাপের বচন শুনি ধাইয়া ঘরে যায়।
রুণু রুণু করিয়ে নূপুর বাজে পায়॥

মিশ্র বলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে চাহে দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর ॥
কি অদ্ভুত দুই জনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুই জনের বদনে ॥
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গৃহের চারিভিতে ॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥
আনন্দিত দেখি দোঁহে অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হইল পুলকিত সজল নয়ন ॥"

এইরূপে ও নানামতে পিতামাতার মনে অশেষ আনন্দ উৎপাদন করিয়া বিশ্বম্ভর দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। তিনি এই অল্প বয়সেই অনেক সময় স্বীয় অলৌকিক তীক্ষ্ণ-ধীর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে :—

"একদিন শচীদেবী সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া কৈল খাও ত বসিয়া ॥
এত বলি গেল গৃহে কর্ম্মাদি করিতে।
লুটাইয়া লাগিল শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥
দেখি শচী ধাঞা আইল করি হায় হায়!
মাটী কাড়ি লঞা কহে মাটী কেনে খায় ॥
কান্দিয়া কহেন শিশু কেন কর রোষ।
তুমি মাটী খাইতে দিলে আমার কি দোষ ॥

দৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী কি ভেদ ইহার?"

এতদূর বলিয়া প্রভু, পাছে আত্ম-প্রকাশ হয়, পাছে মায়ের মনে পুত্রভাব যাইয়া ভগবান জ্ঞান আইসে, সেই নিমিত্ত যখন শচী কহিলেন, "বৎস! মাটী খাইলে পীড়া হয়, কিন্তু মাটীর বিকার মিষ্টান্নাদি খাইলে পীড়া হয় না।" তখন মাকে ভুলাইতে ও আত্ম-গোপনার্থ প্রভু কহিলেন, "আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, স্তন্য দাও।"

আর একদিন শিশু নিমায়ের দুরন্তপণায় ক্রোধ করিয়া শচী দেবী নিমাইকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, নিমাই মাতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পলাইয়া "আঁস্তাকুড়ে" গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জানিতেন, মাতা কখনই এই অপবিত্র স্থানে আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারিবেন না; তাই স্নেহে অভিভূতা মাতা যখন ক্রোধ ত্যাগ করিয়া নিমাইকে বলিলেন "শান্ত বাপ আমার! ও অপবিত্র স্থানে দাঁড়াইতে নাই, তুমি স্নান করিয়া শুদ্ধ হও;" তখন নিমাই কহিলেন "মা! এই স্থান অপবিত্র নহে; পরন্তু যাহাকে জীব অপবিত্র হয় মনে করে, তাহা মনুষ্য-অন্তরেই আছে।" শিশুকালেই এইরূপ অমানুষিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে শিশু নিমাই বাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের দুরন্তপণাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক দিন নিমাই মহাখটি করিয়া বসিলেন ও হস্তপদ আছাড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন শত চেষ্টা শত যত্ন করিলেও সে দিন নিমাই কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না, অন্য কথা কি সে দিন পুনঃ পুনঃ হাতে তালি দিয়া হরিধ্বনি করিলেও তিনি সুস্থির হইলেন না। উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

"এক দিন সবে হরি বলে অনুক্ষণ ।
তথাপিও প্রভু পুনঃ করয়ে রোদন ॥
সবেই বলেন শুন বাপরে নিমাই ।
ভাল করি নাচ এই হরি নাম গাই ॥
না শুনে বচন কার করয়ে ক্রন্দন ।
সবেই বলেন বাপ কান্দ কি কারণ ?
সবে বল কহ বাপ কি ইচ্ছা তোমার ?
সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর ॥
প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত ।
এই দুই স্থানে মোর আছে অভিমত ॥
একাদশীর উপবাস আজি সে দোঁহার ।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥
সে সব নৈবিদ্য যদি খাইবারে পাই ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াই ॥
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ ॥
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন ।
সবে বলে দিব বাপ সম্বর ক্রন্দন ॥
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুই জন ।
জগন্নাথ মিশ্র সনে অভেদ জীবন ॥
শুনিয়া শিশু বাক্য বিপ্র দুই জন ।
সন্তোষে পূর্ণিত হইল কায় বাক্য মন ॥

দুই বিপ্র বলে বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমনে জানিল আজ শ্রীহরি বাসর।
কেমনে বা জানিল নৈবিদ্য বহুতর॥
বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান।
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার॥"

এইরূপে দেব অর্চ্চনাসম্ভার নিজে গ্রহণ করিয়া ছলে প্রভু নিজ তত্ত্ব বাথান করেন। এখন যেথানে যে কেহ, যে কোনও পূজার আয়োজন করিয়াছে, প্রভু যাইয়া তাহা আস্বাদন করিতেছেন, আর বলিতেছেন:—

"মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আঁসি তোমা স্থান॥"

এইরূপে ও বহুরূপে নবদ্বীপে প্রভুর সুখকর উপদ্রব চলিতে লাগিল। কি গঙ্গাস্নানকারী, ভক্তিমান্, পূজারত অশীতিপর বৃদ্ধ, কি স্নানরতা ক্ষুদ্র বালিকাগণ, কাহারও তাঁহার হস্তে অব্যাহতি ছিল না। কেহ অভিযোগ করিতেছেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে:—

"সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লয়ে যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥

কেহ বলে পুষ্পদূর্ব্বা নৈবিদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান এথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥
আরও বলে তুমি কেন দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥"

বিদ্যারম্ভ।

এই সময় প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করায়, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন, প্রণম্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রাঞ্জল ভাষায় নিমাইয়ের পড়া শুনার যে ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বড় সুন্দর বড় মধুর। যে একাগ্রতায় শচীদুলাল শৈশবে চাপল্য ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই একাগ্রতায় এখন তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন যথা :—

"কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥
আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিয়া পুস্তক রসে সর্ব্ব দেবমণি॥"
"না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণে।"
"পুঁথি ছাড়িয়া নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যা রস ইহার হয়েছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥"
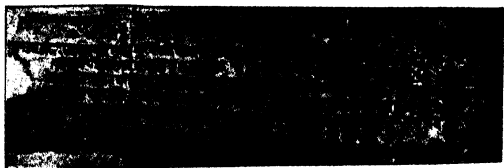
গৌর গদাধরের সম্মিলিত হস্তাক্ষর।

মুর্শিদাবাদ ভরতপুরের এলেকাধীনে একটী গণ্ডগ্রামে শ্রীমদ্ গদাধর আচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট। এই স্থানে সংরক্ষিত একখানি শ্রীমদ্ভাগবতের পুঁথীর একতম পৃষ্ঠার টীকার এক স্থানে মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর আছে বলিয়া উহা পরম পবিত্র বস্তুরূপে নিত্য পূজিত হইয়া থাকে। উপরের ছবিখানি মহাপ্রভুর সেই তথাকথিত হস্তাক্ষরসংযুক্ত পৃষ্ঠাখানির প্রতিকৃতি; কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকাংশে এতই ভুল ভ্রান্তি দৃষ্ট হয় যে, উহা সেই পরম পণ্ডিত গদাধর বা মহাপ্রভুর পঠিত বা লিখিত হইতে পারে কিনা, তাহা সুধী পাঠকের বিচার্য্য।
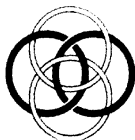
বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগ।

এই সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহা দুর্দ্দৈব সংঘটিত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। অদ্বৈতসকাশে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসার যে অনিত্য, এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় যখন তাঁহার জনক-জননী তাঁহার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন, তখন সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ একদিন গভীর নিশায় গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতা, উপযুক্ত পুত্র-বিরহে বিহ্বল হইলেন ও নিরন্তর "বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ!" রবে রোদন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন সকলে কত মতে বুঝাইলেন ও প্রবোধ দিলেন; যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

"স্থির হও মিশ্র কেন দুঃখ ভাব মনে।
সর্ব্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটী কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠ বাস॥
এই কুল ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র তোমার হ'বে বংশধর॥
ইহা হইতে সর্ব্বদুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি পুত্র কি করিবে এ পুত্র যাহার॥"

তাঁহারাও দুর্লভ পুত্ররত্ন বিশ্বম্ভরের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া বিশ্বরূপের শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইয়ের দৌরাত্ম্য ও চাপল্য একেবারে অন্তর্হিত হইল এবং তিনি ধীর ও শান্তভাবে পিতামাতার সেবা শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারাও

ক্রমে নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের বিরহব্যথা একরূপ ভুলিয়া গেলেন। বিরহব্যথা ভুলিলেন বলিয়া সুপণ্ডিত জগন্নাথ মুহূর্ত্তের জন্য একথা ভুলিলেন না যে, পুত্র শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াই সংসারে বিরাগী হইয়াছেন; সেজন্য তিনি দ্বিতীয় পুত্র "অন্ধের যষ্টি" নিমাইয়ের লেখা পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে :

"সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হ'তে হইল বাহির॥
এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান।
ছাড়িয়ে সংসার-সুখ করিবে পয়ান॥
অতএব ইহার পড়িয়ে কার্য্য নাই।
মূর্খ হ'য়ে ঘরে মোর রহুক নিমাই॥"

পিতামাতার তখন ধ্রুব লক্ষ্য, কিসে নিমাই সংসারে থাকে। বিদ্যা চাহি না, ধন চাহি না, মান যশ কিছুই চাহি না, চাহি নিমাই সংসারে থাকুক, সেজন্য জ্ঞানী শিশু পিতামাতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া এক রন্ধনের বর্জ্জিত হাঁড়ির উপর গিয়া বসিলেন এবং খটী করিলেন। পুণ্যশীলা, স্নেহময়ী জননী, কত বুঝাইলেন, নিমাই কোন কথা শুনিলেন না; পরে শচী যখন বলিলেন যে, এত দিনে কি তোমার এই জ্ঞান জন্মিল? তখন শিশু উত্তর করিলেন, যথা ভাগবতে :—

"প্রভু বলে মোরে তোরা না দিলি পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে?
মূর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান॥"

প্রভুর এই চাতুরী-লীলার পূর্ণফল ফলিল। বৃদ্ধ মিশ্র পুত্রের এই

অনন্যসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখিয়া সাহ্লাদে তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। শীঘ্রই অলৌকিক মেধাবলে ও অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন।

উপনয়ন।

এই সময়ে নিমাইয়ের বয়স মাত্র নয় বৎসর। সুতরাং জগন্নাথ তাঁহার উপনয়ন দিবার আয়োজন করিলেন। এই উপনয়নকালে মুণ্ডিতকেশ, রক্তবস্ত্রপরিহিত নবীন ব্রহ্মচারীকে যখন পিতা শাস্ত্র-সম্মত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন শিশু নিমাই আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পতিত হইলেন। সকলে দেখিলেন, তখন সেই দেবশরীর হইতে অলৌকিক তেজ বাহির হইতেছে ও অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব পুনঃ পুনঃ দেহে সঞ্চারিত হইতেছে এবং অবিরলধারায় নয়ন হইতে ধারা বহিয়া পৃথিবী ভিজিয়া যাইতেছে। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং এ দেহে যে গোপাল বিরাজ করিতেছেন, ইহাই সকলের ধারণা হইল, সেজন্য তাঁহারা সেইক্ষণ হইতে নিমায়ের "গৌরহরি" নামকরণ করিলেন।

গ্রন্থ-রচনা।

নিমাইয়ের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাম ত্যাগ করিলেন। পিতৃ-বিয়োগে বালক নিমাই মহাদুঃখে নিপতিত হইলেন

কিন্তু দুঃখে পড়িয়াও তাঁহার বিদ্যানুরাগের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং তিনি এই সময় হইতে আরও নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই অল্প বয়সে ঘরে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনিমাইএর গুরুদত্ত উপাধি "বিদ্যাসাগর" ছিল, তাঁহার প্রণীত টীকাও সেই কারণে "বিদ্যাসাগরী" বলিয়া খ্যাত হয়; যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

"দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার।
ব্যাকরণে করে টিপ্পনী আপনার॥"

পুনশ্চ "অদ্বৈত প্রকাশে" :—

"বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত।
"বিদ্যাসাগরী" নামে টীকা যাহার রচিত॥"

ঐ টীকা সেই তদানীন্তন নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জনসমাজে এবং পূর্ব্ব বঙ্গের সর্ব্বত্র বহুল আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ন্যায়পাঠার্থী পড়ুয়াগণের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গর্ব্ব-খর্ব্বকারী রঘুনাথ তখন সর্ব্বপ্রধান। এই বালক নিমায়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তিনিও শীঘ্র মলিন হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ বহু গবেষণায় যে তর্কের মীমাংসা করিতেন, নিমাই শ্রবণমাত্রেই তাহার সমাধান করিয়া দিতেন। একদিন রঘুনাথ কোন জটিল তর্কের মীমাংসার্থ নবদ্বীপের উপকণ্ঠস্থ পর্ণক্ষেত্রে এক উডুম্বর বৃক্ষতলে একাগ্রমনে চিন্তামগ্ন ছিলেন; তিনি চিন্তায় এরূপ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে পক্ষিগণ গাত্রে মলত্যাগ করিলেও তাঁহার চিন্তাভঙ্গ হয় নাই; এইরূপ এক অহোরাত্র অতিবাহিত হইলেও তর্কের স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হইতে না পারায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং সহাধ্যায়ী শ্রীনিমাইএর শরণাপন্ন হইলেন। তীক্ষধী

নিমাই যেন চিরাভ্যস্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ উক্ত বিষয়ের সমাধান করিয়া দিলেন।

উদারতা।

এই সময়ে নিমাই ন্যায়শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া একখানি ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। যে ন্যায়দর্শনে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয়, বালক নিমাই সেই ন্যায়ের প্রাঞ্জল টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ ঔদার্য্য বশতঃ ঐ গ্রন্থরত্ন নষ্ট হইয়া যায়। তিনি একদিন উক্ত গ্রন্থ হস্তে গঙ্গাপার হইতেছিলেন, সেই নৌকায় দীধিতিকার রঘুনাথও ছিলেন, তিনিও তখন ন্যায়ের টীকা রচনা করিতে ছিলেন; সুতরাং কথাচ্ছলে যখন উভয়ে উভয়ের গ্রন্থের বিবরণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রঘুনাথ দেখিলেন, এই অদ্ভুত গ্রন্থ প্রচারিত হইলে তাঁহার গ্রন্থ পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র; তাই তিনি আকুল হৃদয়ে কাতরকণ্ঠে নিমায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উদারচরিত্র নিমাই ব্রাহ্মণের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকৃত টীকাখানি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন; এবং সেই হইতে সেই অকল শাস্ত্রের চর্চ্চাও পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-মিলন।

গৌরহরি অলৌকিক রূপবান ছিলেন। তাঁহার তপ্তকাঞ্চননিভ বর্ণ, সুদীর্ঘ অবয়ব, ব্যাধি-মাত্র-বিবর্জ্জিত অতুলনীয় সুন্দর স্বাস্থ্য, কমনীয় কান্তি, টলটল লাবণ্য, কুঁদে কাটা মুখখানি যে দেখিত, তাঁহারই হৃদয় বিগলিত হইত; বিশেষতঃ এই সময়ে নবযৌবনের অঙ্কুরে তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া একেবারে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তখন

চতুর্দ্দিক হইতে এই রূপবান সুপাত্রের উপর কুমারী-কন্যার পিতামাতেরই দৃষ্টি পড়িল, এবং পরিশেষে বনমালী নামক একজন ঘটক ব্রাহ্মণ, নিমাইয়ের এক সম্বন্ধ আনিলেন। শচীও এই সময়ে পুত্রকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন, তাঁহার ভয়, পাছে নিমাইও তাঁহার অগ্রজের ন্যায় সংসারে বিরাগী হয়েন। নিমাইও মায়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন; এবং অনতিবিলম্বে নবদ্বীপ-নিবাসী বল্লভ আচার্য্যের সাক্ষাৎ-কমলা-স্বরূপা কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

চতুষ্পাঠী-স্থাপন।

এই সময়ে নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে স্বয়ং এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। শীঘ্রই এই তরুণ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং অসংখ্য ছাত্র নিত্য আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল, এইরূপে দিন দিন তাঁহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

দিগ্বিজয়ী-বিজয়।

এই সময় নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনসমাজ আলোড়িত করিয়া নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমাকাশে দিগ্বিজয়ীরূপী এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী ভারতবর্ষীয় যাবতীয় পণ্ডিত-প্রধান স্থান জয় করিয়া পরিশেষে বহু পরিবার ও শিষ্য সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নবদ্বীপের যশোহরণ করিয়া

করিলেন, "যদি কোনও পণ্ডিত সাহসী হয়েন, তিনি আসিয়া আমার সহিত বিচার করুন, নতুবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।" সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের সহিত বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া নবদ্বীপের তাবৎ নবীন ও প্রবীণ অধ্যাপক ভীত হইলেন, সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলেন—বুঝি এত দিনে নবদ্বীপের যশোহানি হয়। কিন্তু তরুণ নিমাই সহাস্য আস্যে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সময়ে নিমাইয়ের সহিত দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ হইল, তখন সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যার ম্লান জোৎস্নায় গঙ্গাবক্ষ তখন এক অনির্ব্বচনীয় মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে, তাই কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীনিমাই দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন, "আপনার মধুর বচনই কবিতা, অতএব কৃপা করিয়া আপনি সম্মুখ-বাহিনী পতিত-পাবনা সুরধুনীর কিঞ্চিৎ মহিমা বর্ণন করুন, আমরা শুনিয়া কৃতার্থ হই।" এই বাক্যে কেশব সরস্বতী স্মরণ পূর্ব্বক গঙ্গার সেই সময়ের শোভাবর্ণন করিয়া একটী সুদীর্ঘ অপূর্ব্ব স্তোত্র রচনা করিলেন। স্তব শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত। বলিবামাত্র এরূপ একটী সুদীর্ঘ সুন্দর স্তব রচনা করা যে মনুষ্যের সাধ্য, তাহা তাঁহারা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিলেন, সেজন্য বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ও ছাত্রগণ শ্রীহরি স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুঝি এইবার নিমাই পণ্ডিত পরাজিত হয়েন—বুঝি নবদ্বীপের সর্ব্ব গর্ব্ব আজ হইতে খর্ব্ব হইয়া যায়। কিন্তু নিমাই কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া দিগ্বিজয়ীর বহুল প্রশংসা করিয়া উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাচ্ছলে দোষগুণ বিচার করিতে অনুরোধ করিলে, গর্ব্বিত কেশব প্রভুকে বালক জ্ঞানে প্রথমে কহিলেন, যথা চৈতন্য চরিতামৃতে :—

"ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার?"

কিন্তু এই উত্তরে প্রভু পশ্চাদ্‌পদ হইবার পাত্র নহেন, তাই যখন পুনরায় ঐ শ্লোকের কোনও এক অংশের ব্যাখ্যার নিমিত্ত তিনি খটী করিলেন, তখন কেশব প্রভুকে লজ্জা দিবার নিমিত্ত "কোন্ শ্লোকটী লইয়া আমি বিচার করিব বলুন" বলিলেন। কেশব মনে করিয়াছিলেন, ঝড়ের ন্যায় দ্রুত তিনি যে স্তব আবৃত্তি করিয়াছেন, তাহা কাহারও মনে রাখা অসম্ভব, কিন্তু প্রভু যখন অবলীলাক্রমে তাঁহার পঠিত শত শ্লোকের মধ্যে এইটি আবৃত্তি করিলেন —

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয়া শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরভার্চ্চ্যচরণা।
ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥"

তখন কেশব বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন—মনে হইল, এ বস্তুটী কি ? যথা চৈতন্য চরিতামৃতে :—

"এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল ॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥
প্রভু কহে দেববরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর ॥"

শ্লোক-আবৃত্তি-মাত্রেই কেশবের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছিল, পরে যখন নিমাই তাঁহার শ্লোকস্থিত "ভবানীভর্ত্তু" শব্দে "বিরুদ্ধ মতি দোষ," "বিভবতি" শব্দের পর "ক্রম ভঙ্গ দোষ", "শ্রীলক্ষ্মী" শব্দে পুনরুক্তি বদাভাস এবং দ্বিতীয় "শ্রীলক্ষ্মী" শব্দে "অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ" দোষ ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সগৌরব আটোপ ব্যর্থ করিলেন, তখন ভাগ্য-

বান্ দিগ্বিজয়ী পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; প্রভুও মিষ্ট কথায় ও সদয় ব্যবহারে তাহাকে তুষ্ট করিয়া বাসায় পাঠাইলেন যথা—

"এই মত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুখ নাহি পায়॥"

এই দিগ্বিজয়ী পরম পণ্ডিত সরস্বতীর প্রসাদে প্রভুর স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া পরদিন তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দণ্ড-কমণ্ডলুধারী হইয়া ও কৌপীন পরিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রাণার্পণ করিলেন।

দিগ্বিজয়ী-বিজয়ের পর হইতেই প্রভু নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন।

রহস্য-প্রিয়তা।

পদগৌরবে অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ হইলেও প্রভু বয়সে অতি নবীন, সুতরাং তরুণ বয়সে প্রবীণোচিত শিক্ষা ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তিনি সারল্যে শিশুর ন্যায় ছিলেন। শৈশবের চঞ্চলতা, বাল্যের দুরন্তপণা তখনও তাঁহাতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু অন্যত্র তাঁহার যেমনই ভাব হউক, যৌবনে যেখানে চাপল্য না থাকা বাঞ্ছনীয়, সেখানে তিনি পরম সংযত ছিলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

"এই মত চাপল্য করেন সব সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন নয়ন-কোণে॥
সবে পরস্ত্রী মাত্র নাহি উপহাস।
স্ত্রী দেখে দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥"

শ্রীহট্টিয়া লোক দেখিলে তাঁহার ব্যঙ্গস্পৃহা কিছুতেই বাধা মানিত না। তাঁহারাও ছাড়িবার পাত্র নহেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

"শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ মহাশয়?
পিতা মাতা আদি করি তাবৎ তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার?"

কিন্তু রহস্যপ্রিয় অধ্যাপক মহাশয় তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না বা নিরস্তও হইতেন না। যথা—

"তাবৎ শ্রীহট্টিয়ারে চালেন ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥"

তাঁহার তীব্রশ্লেষ হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ সময়ে যাঁহার প্রতি প্রভুর যে পরিমাণ শ্লেষ বা বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সহিত প্রভুর তত ঘনিষ্টতা দেখা যায়। গদাধর পণ্ডিতকে পথে পাইয়া প্রভু বলিতেছেন, যথা—

"হাসি দুই হাত প্রভু রাখিলা ধরিয়া।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন।
প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ?"

আবার মুরারীগুপ্তকে—

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়?
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ, পিত্ত, অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"

এইরূপে—

"শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা বাক্য ব্যয় ভয়ে সবে পলায়েন॥
সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ ব্যাখ্যা বিনা আর কিছুই না বাসে॥
দেখিলেই তাঁরে মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহ পলায়েন শেষে॥
যদি কেহ দেখে তাঁরে আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসার ডরে॥"

ভক্তির বাজনা।

এই তরুণ অধ্যাপকের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা-মণ্ডিত হাস্যে ও শ্লেষে যখন নবদ্বীপস্থ সমগ্র বিবুধজন ব্যতিব্যস্ত; যখন ব্যাকরণের ও ন্যায়ের অতলগর্ভে ভক্তির কথা ডুবিয়া যাইতেছিল, তখন একদিন এমন একটী ঘটনা সংঘটিত হইল যে নিমাইয়ের জীবনের স্রোত অন্য পথে প্রধাবিত হইল।

এই সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষ্য রাজপথে যাইতেছিলেন, তখন মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাস্নানে গমন করিতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টলবাসী একজন বৈদ্যকুমার, নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং কিছু-দিন প্রভুর সহাধ্যায়ীরূপে পাঠ করেন। এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্রের কচকচি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের পথিক হইয়া পরম হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং সুগায়ক বিধায় অদ্বৈতের সভায় কীর্ত্তন করিতেন। মুকুন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ

সম্ভাষ করিতে হয়, এই ভয়ে তটস্থ হইলেন ও অন্য পথে প্রয়ান করিলেন। পরম মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন, "দেখ! দেখ! মুকুন্দ আমাকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি—

"এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব আমি সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমাকে দেখিয়া যে সকলেতে পালায়।
তাহারাও যেন মোর গুণকীর্ত্তি গায়॥"

শ্রী শ্রীঈশ্বরপুরী-মিলন।

এতদিনে শ্রীনিমাই ধর্ম্ম আচরণে মন দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ, কিন্তু তিনি ভক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহাতে একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা ঈশ্বরপুরী অকপট নিষ্ঠা ও প্রেমার্চ্চনার দ্বারা শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হালিসহরের একাংশ কুমারহট্টে ইহাঁর নিবাস ছিল। ইনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। গুরু মাধবেন্দ্র আসন্নকালে শিষ্যের ঐকান্তিক সেবা ও শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া স্বীয় সমুদায় প্রেম সম্পত্তি ঈশ্বরপুরীকে সমর্পণ করিয়া যান।

তিনি মৃত্যুকালে এই শ্লোকটী রচনা করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রকট হয়েন—

"অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিংকরোম্যহম॥"

এই ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর বড়ই মৈত্রী জন্মে এবং দুই জনে সর্ব্বদা ভক্তিশাস্ত্র পঠন ও ভক্তিকথা প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু ঈশ্বরপুরী শীঘ্রই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে যাত্রা করেন। এই সময়ে ইঁহাদের সহিত আর একটী সাথী মিলিত হয়েন, তিনি গদাধর। তিনজনে বসিয়া প্রতি সন্ধ্যায় এখন ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা ও অবসর মত ঈশ্বরপুরীকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের রসাস্বাদ করিতে থাকেন। এইরূপে দুই একটী করিয়া ক্রমে অনেকেই তাঁহার মত ভক্তি চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই এ সম্বাদ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ-সকাশে প্রচারিত হইল।

ভাবাবেশ।

এই সময়ে একদিন অকস্মাৎ প্রভুর ভাবাবেশ হইল। যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

"একদিন মহাবায়ু মন্দ করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায় হাসি ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥
হুঙ্কার গর্জ্জনে করে মালসাট মারে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহাকেই মারে॥
আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥

সর্ব্ব অঙ্গে কম্প প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
প্রভু বলে মুঞি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর
মুঞি বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বম্ভর॥"

অনেকে এই আবেশ-ভাবের অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক এই ভাব অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। এই আবেশের পর হইতেই শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত তাঁহার কিছু অধিক সম্প্রীতি জন্মে।

পূর্ব্ববঙ্গ-বিজয়।

এখন নিমাইয়ের বয়স মাত্র অনতিক্রান্ত বিংশতি বৎসর। এই অল্প বয়সেই তাঁহার আচার্য্য-খ্যাতি দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে ১৪২৭ শক, জ্যৈষ্ঠ মাসে দয়াল প্রভু একবার পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট বিদায় লইয়া সশিষ্য পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা করেন। শ্রীনিমাই যখন সগোষ্ঠী তালখড়ি গ্রামে (বর্ত্তমান যশোহর জেলার মাগুরার দক্ষিণ পশ্চিমে) বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর বাটী হইতে পদ্মাতীরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গীরা দেখিলেন যে,তাঁহাদের ঠাকুরটীর যশ,তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই দেশ ব্যাপিয়াছে—আর কি মোহে কার আকর্ষণে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিতেছে। তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীও তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন;—

"মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥

বৃহস্পতি দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নহে।
ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনে লয়ে॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনা এমন পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় প্রভু লয় চিত্তবিত্ত॥
উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুন দ্বিজমণি॥

এইরূপ সসম্মানে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিয়া ও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দয়াল প্রভু শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সজ্জন, দুর্জ্জন, আচারী, বিচারি, পণ্ডিত, অধম, নীচ, কাঙ্গাল, যে যেখানে ছিল, সকলকে অকাতরে হরিনাম নিধি বিলাইয়া পরিশেষে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিবার কালে ভাগ্যবান তপন মিশ্রকে কৃতার্থ করিয়া তাঁহাকে কাশী যাইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিতে আদেশ করেন।

নিমাই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃ-চরণে প্রণত হইলেন, এবং আহার ও বিশ্রামাদির পর যখন শচীদেবী আকুলকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, তখন জননীর রোদন দেখিয়া নিমাই বিস্মিত হইলেন, এবং পরে যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী তাঁহার বিচ্ছেদকালের মধ্যে সর্পদংশনে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন, তখন কিয়ৎ-কাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাচার-অনুগামী মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত কহিলেন :—

"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মিলন।

এই বলিয়া তিনি শোকাকুলা জননীকে প্রবোধ দিলেন। মাতা আপাতঃ দৃশ্যে প্রবুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু সরলমতি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক ভয়, পাছে বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাইও সংসারে বীতরাগ হন, বিশেষতঃ পুত্রের এই নবযৌবনে তাঁহাকে বন্ধনহীন অবস্থায় সংসারে রাখিতে তাঁহার বড় ভয় হইল, সেজন্য অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগিনী হইলেন। মাতৃ-অনুরক্ত শিশুপ্রকৃতি নিমাইও মাতৃ-আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সুশীলা কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের তদানীন্তন অন্যতম প্রসিদ্ধ ধনী ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত খাঁ, মুকুন্দ সঞ্জয় এবং নিমায়ের পড়ুয়াগণ স্বীয় স্বীয় স্কন্ধে ব্যয় ভার বহন করিয়া সবিশেষ সমৃদ্ধির সহিত এ বিবাহ সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীধাম গয়া-যাত্রা।

বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর কাল নিমাই নবদ্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যাদান করিয়া ও স্থিরভাবে সংসারে রহিয়া শচীর মনে হর্ষোৎপাদন করিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ তাঁহার একবিংশতি বর্ষ বয়সে এক দিন তিনি পিতৃঋণ পরিশোধার্থ গয়াক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্নেহময়ী শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারিলেন না—সেজন্য সঙ্গে নিমায়ের মাতৃস্বসৃপতি চন্দ্রশেখর ও তাঁহার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ১৪৩০

শকের আশ্বিন মাসে বাটী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে চলিয়া—যখন মান্দারে (বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার বাঁশী বা বাউশী গ্রাম) আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন অকস্মাৎ একদিন নির্ব্যাধিশরীর নিমাইয়ের জ্বর প্রকাশ পাইল। এই পীড়াই প্রভুর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ পীড়া। জীবনে এই একবার ব্যতীত আর কখন তাঁহার জ্বর প্রকাশ পায় নাই, তাঁহার এই আকস্মিক পীড়ায় তাঁহার সঙ্গীরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাদের চিন্তিত হইতে নিষেধ করিয়া তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের পাদোদক আনয়ন করিতে বলিলেন এবং উহা পান করিবামাত্র তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলেন। মহাজনগণ অনেকে প্রভুর এই ব্যাধির অনেকরূপ বিচার করিয়াছেন। একজন এইরূপ বলেন যে, যখন তাঁহারা মান্দারে উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহার কোন কোন সঙ্গী তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেজন্য করুণাসিন্ধু নিমাই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য এই লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এইরূপে আর কিছু দিন চলিয়া তাঁহারা শ্রীধাম গয়া প্রবেশ করিলেন। এখানে প্রবেশমাত্র প্রভুর অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহার সুমধুর চাঞ্চল্য, দ্রুত গমন, স্বাভাবিক কৌতুকপ্রবৃত্তি সমস্তই যেন কোন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া গেল, - যেন মহাযোগী মহাযোগে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তখন চাপল্য অপগত হইল বটে, কিন্তু প্রেম আসিয়া সেই স্থান অধিকার করায়, তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। যথা—চৈতন্য ভাগবতে :—

"যে প্রভু আছিল অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥"

মন্ত্রগ্রহণ ।

আবার যখন এই পবিত্র গয়াক্ষেত্রে তাঁহার সহিত পূর্ব্বপরিচিত ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল, তখন তাঁহার অধীর অবস্থা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে ভক্তাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর দেবমূর্ত্তি তাঁহার নেত্রে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল—আর অমনি আকুল কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সুগভীর, সুপবিত্র, সুমহান, সুমধুর কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। আবার যখন শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আসিলেন—আর গয়ালী বিপ্রগণ ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে শ্রীপদের প্রভাব বর্ণন করিয়া কহিলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে ঃ—

"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥
তিলার্দ্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হ'য়েন অধিকার পাত্র ॥
যোগেশ্বর সবেরো দুর্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥
যে চরণে ভাগীরথী হইল প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥
অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥

তখন সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, অজভব পূজিত, যোগীজন-দুর্লভ শ্রীপদ

দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে শ্রীনিমাই একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত হইলেন। পরে সঙ্গিগণের যত্নে যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন অজস্র পুলকাশ্রু, গোমুখীনিঃসৃত গঙ্গাম্বুধারানিভ, তাঁহার নয়ন বাহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে—বক্ষ হইতে সহস্র ধারায় ধরায় পতিত হইলে সে স্থান জলময় হইল। উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র অশ্রুবারিতে স্নাত হইয়া, জীবনে সর্ব্বপ্রথম এরূপ আশ্চর্য্য প্রেম বিকাশ ও অপূর্ব্ব অশ্রুপাত দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্ত-কণ্ঠে নিমাই চন্দ্রশেখরাদি সঙ্গীগণকে কহিলেন, "তোমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর—আমি আর সংসারে যাইব না—আমি প্রাণেশ্বরের উদ্দেশে মথুরা চলিলাম—আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সান্ত্বনা প্রদান করিও"; তখন তাঁহারা বড় বিপদে পড়িলেন; পরে বহু যত্নে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ বল প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা এই আবেশময় ভক্তির প্রতিমাটীকে পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

মধ্যলীলা।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে দেখিলেন, সেই উদ্ধতের শিরোমণি নিমাইয়ের পূর্ব্বভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। শিশুর ন্যায় সরল ভাব ও চাঞ্চল্য, সেই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমা, সেই চঞ্চল গমন, উদ্দাম বাকপটুতায় সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখনকার তাঁহার অবস্থা বর্ণন করিয়া বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে॥
পরম বিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে যে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে পূর্ণ হইল সর্ব্বস্থান॥

সর্ব্ব অঙ্গে মহাকম্প পুলকে পূর্ণিতে।
"হা কৃষ্ণ!" বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিতে॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাহি হইলা মূর্চ্ছিতা।
অতক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হইল চকিত॥
যে ভক্তি দেখিনু আমি তাঁহার নয়নে।
তাহারে মনুষ্য বুঝি নহে আর মনে॥

ভাবাবেশ।

এইরূপে গৃহে আসিলেও নিমাই গয়ার সেই সুমধুর স্মৃতি, মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। যখন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে গদাধর,সদাশিব,শ্রীমান পণ্ডিত প্রমুখ শ্রীপ্রভুর পরম ভাগবত বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া তাঁহাকে গয়ার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন, বহু চেষ্টাতেও কোনও কথা বলিতে পারেন নাই; বলিতে যাইয়া প্রেমাবেশে, ভাবাধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর অমনি পদ্মপলাশ লোচন হইতে দর দর-ধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া মুখে যাহা ব্যক্ত হয় নাই, তাহাই প্রকাশ করিয়া দিল। এই দিন রাত্রিকালে নিমাইচাঁদ আপন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কতকগুলি সুবাসিত কুসুম-হস্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। নিমাই তাঁহার সহিত দুই একটী বাক্যালাপ করিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন ও অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন; তখন দেবী, শ্বশ্রূদেবীর নিকট গমন করিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করিলেন। স্নেহময়ী জননী পুত্রের অবস্থা শ্রবণমাত্র পুত্রবধূর সহিত তাহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। মাতৃদর্শনে নিমাইয়ের ভাবোচ্ছ্বাস যেন আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা

যেন অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ও মাতাকে বলিলেন, "মা! আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে এক সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, এই বলিয়া ভাবে বিভোর প্রেমের ঠাকুরটী শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। মাতা ও পত্নী একমনে সেই সুমধুর বচন-সুধা পান করিতে লাগিলেন, এইরূপে রজনী অতিবাহিত হইল।

নাম-কীর্ত্তন।

এইরূপ দিব্য প্রেমোন্মাদের মধ্যে যখন বাহ্য জগৎ তিনি একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন এক দিন তাঁহার অসংখ্য ছাত্র, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পাঠ গ্রহণ করিতে আসিল। তখন তাঁহার চকিতের ন্যায় মনে আসিল যে, অধ্যাপনা তাঁহার একটী কার্য্য আছে, আর উহা উপেক্ষিত হইতেছে, তাই তিনি ছাত্রগণকে প্রথমে কাকুতি করিয়া বলিলেন, "ভাই সব! আমাকে মুক্তি দাও, আমি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছি, আমি আহ্লাদে সম্মতি দিতেছি, তোমাদের যেখানে ইচ্ছা, যাইয়া বিদ্যাভ্যাস কর"; কিন্তু যাঁহারা এতদিন নিমাইয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য কাহারও নিকট পাঠ লইতে হয়, সেই ভয়ে গ্রন্থের বন্ধন পর্য্যন্ত খুলেন নাই এবং তাঁহার অপেক্ষায় অস্থির হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহারা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, সেজন্য ভক্তাধীন নিমাই আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ, শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাসের আদেশে তিনি পুনরায় সকলকেই পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। আর তিনি তখন যা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, সে সমস্তই হরি-বিষয়ক হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার এই অর্দ্ধ বাহ্যভাবও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। সুতরাং তিনি

ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসমান হইলেন। তাঁহার ভাগ্যবান শিষ্যগণও সেই দিন হইতে তাঁহার ভক্তশ্রেণিমধ্যে গণ্য হইলেন। আর তিনিও তাঁহাদিগকে লইয়া অপূর্ব্ব নামকীর্ত্তন সৃষ্টি করিলেন। নিমাই গাহিতেছেন; যথা ভাগবতে :—

(কেদারা রাগ)।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
(যাদবায়, মাধবায় কেশবায় নমঃ)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
(একবার বলরে ভাই)।

আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দিয়া তাঁহার অসংখ্য ভক্তশিষ্য গাহিতেছেন। তাঁহারা গাহিতেছেন, আর নাচিতেছেন। তখন প্রভুর অবস্থা অতি রমণীয়। যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ প্রেম-রসে।
গড়া গড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে॥
বোল্ বোল্ বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥

শ্রীহরিসভা-স্থাপন।

তখন সমগ্র নবদ্বীপে এক মহাকর্ষণ আরম্ভ হইল—আর দলে দলে কি ভক্ত, কি পাষণ্ড, সকলে কীর্ত্তন শুনিতে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটী অভিমুখে ছুটিল। শীঘ্রই এই শুভসংবাদ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইল, আর শ্রীবাস আদি ভক্তগণ আসিয়া একে একে

তাহার পার্শ্বে মিলিত হইতে লাগিলেন। শ্রীবাসের আদি নিবাস শ্রীহট্ট, ইহারা চারি সহোদর; বিদ্যাশিক্ষার্থ সকলে নবদ্বীপে আগমন করেন ও ক্রমে এখানেই বিবাহাদি করিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহারা সকলেই হরিভক্ত ও কৃষ্ণগত-প্রাণ ছিলেন। শ্রীবাস আপন বাটীতে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন ও তৎকালপ্রচলিত তান্ত্রিক ক্রিয়াদির বিপক্ষে তর্ক বিতর্ক করিয়া শাস্ত্রের যথাযথ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন বলিয়া প্রথমে অনেকের বিরাগ-ভাজন হইয়া ছিলেন। এই শ্রীবাসের গৃহেই নিমাই হরিসভা স্থাপন করিলেন ও সমস্ত দিবা রাত্রি হরিগুণ কথন, ও নাম সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত-মিলন।

নিমাই যখন এইরূপে হরিপ্রেমে বিভোর, তখন এক দিন অদ্বৈত প্রভু প্রেমাবেশে ধ্যানে দেখিলেন যে, যাহার জন্য তিনি এতদিন তপে রত, সেই তিনি এত দিনে আসিয়াছেন. আর শচীপ্রাণ শ্রীনিমাই সেই যোগীজনারাধ্য, ব্রহ্মার দুর্লভ অপার্থিব ধন। তাই যখন একদিন প্রভু গদাধরের সহিত অদ্বৈতের নবদ্বীপস্থ ভবনে যাইয়া দেখিলেন যে, ভক্তশিরোমণি আচার্য্য ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে তুলসী সেবা করিতেছেন, তখনই প্রেমাবিষ্ট হইয়া সেই ভক্তিমান ভাবুক নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আচার্য্য ত্রস্তে ব্যস্তে নিকটে আসিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিলেন; আর অমনি তাঁহার পূর্ব্বকার ধ্যানের বিষয় স্মরণ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে জগন্নাথমিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর শায়িত নহেন, সেখানে তাঁহার আরাধ্যধন জগৎজীবন শ্রীহরি

বিরাজ করিতেছেন, সেজন্য ব্যস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাজল তুলসী চন্দন আনিলেন, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ সজ্জা করিলেন, আর ভক্তিতে বিভোর, অশীতিপর বৃদ্ধ, অধীর বিপ্র, প্রেমে বিহ্বল হইয়া নিমাইয়ের পদে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, আর প্রণাম করিলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে :—

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বয়োবৃদ্ধ অদ্বৈত প্রভুকে এইরূপে নিমাইয়ের পাদ বন্দনা করিতে দেখিয়া, নিমাইয়ের অভিন্নহৃদয় সাথী গদাধর নিমাইয়ের অকল্যাণ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এমন সময়ে নিমাই বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈতকে বলিলেন,—"তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর, আমার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন, তাই তোমার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।" অদ্বৈত নিমাইয়ের এবম্বিধ বাক্‌চাতুর্য্যে সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন; তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তবে কি এই বস্তুটী তাঁহার অভীষ্টদেব নহেন? যাহা হউক, যখন সন্দেহ হইয়াছে, তখন পরীক্ষা প্রয়োজন। তজ্জন্য মনে করিলেন যে, দেখি, শান্তিপুরের বাটী যাইয়া বসিয়া থাকি, আর ভক্তিমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করি। যদি নিমাই প্রকৃতই আমার প্রাণবল্লভ হয়েন, তবে নিশ্চয়ই আমার এই অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীনিমাই ভক্তশিরোমণি শ্রীঅদ্বৈতের এই আকাঙ্ক্ষা শীঘ্রই পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দণ্ডপ্রসাদ প্রদান করিতে স্বয়ং নিত্যানন্দ-সমভিব্যাহারে অদ্বৈতের শান্তিপুরস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই যাত্রায় শান্তিপুর যাইতে শ্রীপ্রভু ললিতপুর নামক একখানি অধুনা-গঙ্গাগর্ভশায়ী লুপ্ত গ্রামে এক তান্ত্রিক বামাচারী সন্ন্যাসীর অতিথি হইয়া ঐ সন্ন্যাসী কর্তৃক "আনন্দ-আসব" পানে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি উৰ্দ্ধশ্বাসে

গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সন্তরণে শান্তিপুর আগমন করেন। এখানে অদ্বৈতকে কৃতার্থ করিয়া তিনি শান্তিপুরের পরপারস্থ অম্বিকাকাল্‌নায় ভক্ত পণ্ডিত গৌরীদাসের বাটীতে আগমন করেন। তাঁহার প্রাঙ্গণস্থিত একটী বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিয়া পণ্ডিতের সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন এবং এখানে কয়েক দিন থাকিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ বিশ্রাম-বৃক্ষটী এবং যে বৈঠার সাহায্যে তাঁহারা তরণী-সঞ্চালনে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, সেই বৈঠাটী ও আরও কয়েকটী তাঁহার ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত সামগ্রী এই অম্বিকাকালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটীতে, যেখানে বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সেবাপ্রকাশ ও তদর্থে মন্দিরস্থাপনা হয়, সেই স্থানে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত ও সংপূজিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, মুরারী প্রমুখ নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দ নিমাইচাঁদের মধুর সংসর্গে বড় সুখেই শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেছিলেন। এক দিন শ্রীবাসের বাটীতে যখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইলেন, তখন কি যেন বলিতে যাইয়া নিমাই বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, পরে মূর্চ্ছান্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও হারাইয়াছি; গয়া হইতে আসিবার পথে একদিন প্রাতঃকালে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কানাই নাটাশালা গ্রামে তমালশ্যামল এক সুন্দর বালক হাসিতে হাসিতে চঞ্চল চরণে আমার নিকট আগমন করিলেন, এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন।" কথা কয়টি বলিয়াই নিমাই অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। গয়া হইতে আসিয়া শুক্লাম্বরের গৃহে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীকে যে কথা বলিতে যাইয়া বলিতে পারেন নাই, এতদিনে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন। এই সময় হইতেই সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হওয়ায় নিমাইচাঁদের বাহ্যিক জ্ঞান সমস্তই অন্তর্দ্ধান হইল। তখন তিনি আপনার মধ্যে ভগবানকে এবং

ভগবানের মধ্যে আপনাকে দেখিয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়িতেন। একদিন বাহ্যজ্ঞানবিরহিত অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া নিমাই গদাধরকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গদাধর! শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?" গদাধর উত্তর করিলেন,—"তোমার হৃদয়মধ্যে." নিমাই এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লাভআশায় উন্মাদের ন্যায় দুই হস্তের নখর দ্বারা আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। গদাধর ও শচী তাঁহার হস্ত ধরিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

প্রেমদান।

এইরূপে কয়েক মাস গত হইল, নিমাই মনের আনন্দে কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে লাগিলেন। কেহ কৃষ্ণপ্রেমপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে বিমুখ করিতেন না। শচীদেবী, গদাধর, শুক্লাম্বর, শ্রীবাস প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে প্রেম-সম্পত্তি লাভ করিলেন। নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্প্রদায় বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শ্রীবাসের গৃহে তাঁহার সম্প্রদায়ের সম্মিলনস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। পাছে অসাম্প্রদায়িক লোক আসিয়া কীর্ত্তনানন্দে বিঘ্ন জন্মায়, এই আশঙ্কায় ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই গৃহের দ্বার বন্ধ করিতেন। বহিরঙ্গ লোকেরা ভিতরে যাইতে না পারিয়া তাঁহাদের উপর নানারূপ অযথা সন্দেহ করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"ইহারা তান্ত্রিক, মদ্য, মাংস, স্ত্রীলোক লইয়া গোপনে কুকর্ম্ম করে।" ইহাদের শাসন সত্বর প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, শীঘ্রই কাজীর সমীপে বিচারপ্রার্থী হওয়া যাউক, নিদ্রিত শ্রীবিষ্ণুকে এমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলে আর কি নিস্তার রহিবে, সংসার রসাতলে যাইবে।"

এই সময়ে একদিন শ্রীবাস আপনার দেবমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে দ্বার মোচন করিতে আদেশ করিতেছেন। দ্বার মুক্ত হইলে শ্রীনিমাই কোনও কথা না বলিয়াই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে প্রতিমূর্ত্তি নামাইয়া স্বয়ং সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। শ্রীবাস প্রত্যক্ষ করিলেন যে, তাঁহার শরীরের জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই অলৌকিক অপূর্ব্ব তেজপ্রভাবে তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন, এবং নীরবে করযোড়ে নিমাইয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। নিমাই বলিলেন, "শ্রীবাস! আমি আসিয়াছি, আমার অভিষেক কর।" শ্রীবাস নিমাইয়ের জ্যোতির্ম্ময় ভুবনপাবন মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আশ্বাস পাইয়া মহা উৎসাহে শ্রীভগবানের অভিষেকের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কেনই বা উৎসাহ না হইবে, জীবের ইহাপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে, কাজেই তিনি মহাহ্লাদে তাঁহার প্রজাগণকে ও পরিবারস্থ সকলকে আহ্বান করিয়া গঙ্গাজল, ধূপ, দীপ পুষ্পাদি দ্বারা যথানিয়মে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রীবাসের বাটীর মহিলাগণ তাঁহার চরণে প্রণত হইলে তিনি তাঁহাদিগের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন. "আমাতে তোমাদের চিত্ত হউক।" সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীনিমাই, শ্রীবাসকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস! তোমরা মুসলমান রাজার অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইও না, আমি প্রেমে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিব।" মানব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কি ভাব প্রাপ্ত হয়, শ্রীবাসকে তাহাই দেখাইতে তিনি শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাতে কৃষ্ণপ্রেম হউক" এই কথা বলিবামাত্র বালিকা 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ'! বলিয়া ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ

অতিবাহিত হইলে নিমাই "উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব, আমি এখন চলিলাম" এই বলিয়া বিষ্ণু-সিংহাসন হইতে নামিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। চৈতন্যলাভের পর তিনি শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীবাস! আমি ত কোনও চপলতা প্রকাশ করি নাই?"

অভিনয়।

আর একদিন শ্রীনিমাই ভক্তগণপরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীবাসের নিকটে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতেছিলেন। কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া নিমাইচাঁদের তাহা অভিনয় করিবার ইচ্ছা হইল। তখন তিনি তাঁহার মাতৃস্বস্পতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অভিনয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে যথাযথ আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন। অভিনয়োপযোগী সাজসজ্জা সংগৃহীত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিবসে চন্দ্রশেখরের বাটীতে অভিনয় আরম্ভ হইল। ভক্তগণ ও তাঁহাদের বাটীর মহিলাগণ অভিনয় দর্শনে উপস্থিত ছিলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। অভিনয়ে হরিদাস কোতোয়ালের, অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের, নিমাই রাধার, গদাধর ললিতার, নিত্যানন্দ বলাইএর এবং শ্রীবাস নারদের অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। এই অভিনয়-কার্য্য এরূপ সুন্দরভাবে সমাহিত হইয়াছিল যে, দর্শকমণ্ডলী মনে করিয়াছিলেন যে, সত্যই যেন তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অভিনেতাগণ নিজ নিজ অভিনীত অংশে তৎ তৎ ভাবে আবিষ্ট হইয়া নটবরের যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অভিনয়-কালে শ্রীনিমাই এর রুক্মিণী, রাধা ও ভগবতীর ভাব হইয়াছিল। অভিনয়অন্তে সকলেই

নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিমাই বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি সেই দিন চন্দ্রশেখরের বাটীতে যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার তেজপ্রভাবে চন্দ্রশেখরের গৃহ সপ্তাহকাল জ্যোতির্ম্ময় ছিল। এই অভিনয়-কথা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্য প্রভু যে কেবলমাত্র বর্ত্তমানকালে প্রচলিত নাম-সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, তাহা নহে, পরন্তু বঙ্গদেশে যাত্রাদিরও প্রবর্ত্তক।

শ্রীনিত্যানন্দমিলন।

এই সময় ইঁহাদের সহিত আর এক মহাপুরুষ আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি অবধূত নিত্যানন্দ। বীরভূমের অন্তর্গত মাইবুঁইচার নিকটবর্ত্তী একচক্রা গ্রামে নিতাইয়ের জন্মভূমি। তাঁহার পিতা হাড়াই পণ্ডিত ও মাতা পদ্মাবতী, ইঁহারা রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন ও সর্ব্বদা ভক্তির চর্চ্চায় রত থাকিতেন। এই আদর্শ দম্পতী পরম ধর্ম্মভীরু ছিলেন। একদিন এক সন্ন্যাসী * অতিথি হইয়া তাঁহাদের নিকট নিত্যানন্দকে কিছুদিনের নিমিত্ত তীর্থ পর্য্যটনে সমভিব্যাহারী হইবার জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-দম্পতী অতিথি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে মনে করিয়া অতিথির হস্তে আপনাদের প্রাণাধিক পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। বালক নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া যখন মথুরা উপস্থিত হয়েন তখন তাঁহার সহিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হয়। পুরীর নিকট নিমাইয়ের অপূর্ব্ব প্রেম-বিকাশ ও ভক্তির বার্ত্তা অবগত হইয়া স্বচ্ছন্দময় নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া নিমাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন।

* এই সন্ন্যাসীই অনেকের মতে নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ।

নিত্যানন্দের চিরানন্দময় সংসর্গে নিমাইয়ের হরি সংকীর্ত্তন ও প্রেম-বৈকল্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

ভক্ত-সম্মিলন।

এইরূপে প্রতিদিন নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর. শ্রীবাস, মুরারী, মুকুন্দ, নরহরি, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, দামোদর, গোবিন্দ বাসু ঘোষ, বক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শত শত ভক্ত আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে যখন প্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাম-কীর্ত্তনে রত হইতেন, তখন নবদ্বীপস্থ কতকগুলি মন্দস্বভাবশালী, অসূয়াপরায়ণ ব্যক্তি বহির্দ্দেশ হইতে নানা প্রকার অত্যাচার ও চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের তপে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির বৃথা আড়ম্বরে প্রভুর দলের কোন বাধা সংঘটিত হইল না, বরং উত্তরোত্তর তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার বিরোধীদল স্বতঃই তাঁহার উপর দিন দিন অধিকতর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল।

জগাই মাধাই উদ্ধার।

দুই ভ্রাতা এই বিরোধী দলের প্রধান ছিল। তাহারা সাধারণতঃ জগাই মাধাই নামে খ্যাত। এই দুটি জীব যেন ভগবানের সৃষ্ট নহে। যেন কোন দুরন্ত পিশাচ এ দুয়ের অন্তর সৃষ্টি করিয়া জগতে আপনাদের কীর্ত্তি ঘোষণার্থ তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে স্থাপিত করিয়াছিল। মনুষ্যের কল্পনায় এমন কোন পাপকার্য্য আসিতে পারে না, যাহা তাহারা করিতে

পরাঙ্মুখ হইত। তাহারা নদীয়ার কোটাল-পদে নিযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু শান্তিস্থাপনের পরিবর্ত্তে পরপীড়নই তাহাদের কার্য্য ছিল। যথা চৈতন্যভাগবতে :—

"সে দুই জনার কথা কইতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পর গৃহদহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বলয়ে কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥
এ দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারও কোন দিন বসতি পোড়ায়॥"

ইহাদের মত পাতকী তখন সমগ্র নদীয়ায় আর ছিল না। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাই দয়াল নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহাদের উদ্ধারার্থে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস যখন জীবে নাম বিলাইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন জগাই ও মাধাই আসিয়া সহসা তাঁহাদের আক্রমণ করিল, এবং মাধাই একটি ভগ্ন কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে এমন দারুণ আঘাত করিল যে তাঁহার মস্তক হইতে অজস্র শোণিত-ধারা বহিতে লাগিল। নিতাই সে দারুণ আঘাত অবহেলা করিয়া যখন প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ্যত হইলেন, তখন মদোন্মত্ত মাধাই আবার তাঁহাকে প্রহার করিতে আসিল। নিত্যানন্দের দেবদুর্লভ চরিত্রবলে পাষাণও বিগলিত হইল। জগাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ এতাবৎ মাধাইয়ের কার্য্য দর্শন করিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল, সে নিত্যানন্দকে পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ঝটিতি বজ্রমুষ্টিতে মাধাইয়ের

হস্তধারণ করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিল। লোকে আসিয়া যখন প্রভুকে এই সংবাদ গোচর করিল, তখন তিনি লোকশিক্ষার্থ যৎপরোনাস্তি কোপ প্রকাশ করিয়া সেই দুই পাষণ্ডীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে—

"প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ এই দোঁহের শরীর।
কিছু কষ্ট নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"

এইরূপে অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দের যত্নে এবং প্রভুর কৃপায় এই দুই মহাপাতক ব্রহ্মার দুর্লভ পদপ্রাপ্ত হইল। যখন নিত্যানন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রভু তাহাদের সর্ব্বদোষ ক্ষমা করিলেন, তখন সেই পাষাণ-হৃদয় ভ্রাতাদ্বয় এই দুই দেবদুর্লভ হৃদয়ের মহাভাব অনুভব করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইল এবং তাঁহাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া এরূপ পবিত্র বৈষ্ণব হইয়াছিল যে—

"এই দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিলেক গঙ্গার সমান॥"

মহাজনগণ এই পবিত্র কাহিনী লইয়া অনেক পদরচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এইটিই বিশেষ প্রসিদ্ধ।—

"আয়রে সংকীর্ত্তনের মাঝে দুটী ভাই।
আজ তোদের হরিনাম দিব জগাই মাধাই॥
মাধাই মার্‌লি মার্‌লি কর্‌লি ভাল রে।
এখন হরি বোলে কোলে আয় রে॥

তুমি মেরেছিলে কলসীর কাণা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না।
আজ হরিনাম দিব জগাই মাধাই ॥"

কাজীদমন।

জগাই মাধাইয়ের ন্যায় ধনশালী, দুর্দ্দান্ত ও প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিদ্বয়ের এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে যদিও অনেকের মনে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইল, তথাপি দুষ্ট চারিজন খলস্বভাব ব্যক্তি কিছুতেই শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ নির্ভীকতা ও সম্মান সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা তদানীন্তন নদীয়ার মুসলমান কাজীর নিকট যাইয়া কত মতে নালিশ করিতে লাগিল। কাজীও তদীয় স্বাভাবিক দৈত্যপ্রকৃতিবশে চালিত হইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিল। যাহারা সংকীর্ত্তন-বিদ্বেষী তাহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া কত প্রকার মিথ্যা কথা রটনা দ্বারা ভক্তগণকে ভীত করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "কাজী আজ নবদ্বীপে ভক্ত রাখিবে না", অপর কেহ বলিল "বাদসাহ স্বয়ং সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, নিমাই পণ্ডিতকে ধরিয়া লইয়া যাইবে," কেহ বলিল "এতক্ষণ নবদ্বীপের ঘাটে সৈন্য আসিয়া পড়িল।" ক্রমে এ সমস্ত প্রভুর গোচর হইল, তিনি কিছু হাস্য করিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই একদিন চাঁদ কাজীর নিকট হইতে কয়েকজন পদাতিক আসিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া গেল। তাহারা নিষেধাজ্ঞা দিয়া যাইল বটে, কিন্তু তাহাদের আপনাদের মুখে কে যেন বল প্রকাশ করিয়া "হরিবোল" বলাইতে লাগিল। ইচ্ছা নাই—চেষ্টা নাই—স্বতঃই ঐ মধুর নাম মুখে আপনি আসিতেছে। কাজী ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞানে মোহের

আবেশে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আরও কঠোর আদেশ প্রচার করেন ; তখন অনেক অল্পাধিকারী ভক্তের মনেও ভয়ের সঞ্চার হইল ; কেহ কেহ বা নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিল। তাই হরিনামমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রচার করিলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে ঃ—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে আজ করিল কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্‌জন ॥
দেব আজি পোড়াইয়া কাজীর ঘর দ্বার।
কোন্ কর্ম্ম করে দেখ রাজা বা তাহার ॥
চল চল সব ভাই নাগরিয়াগণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ বহন ॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিব দেখ কোন্ কর্ম্ম করে ॥
তিলার্দ্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবেক্ ঝাট করিয়া ভোজনে ॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহাদীপ ল'য়ে আসিবেক সে ॥"

যেমন প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই আদেশপ্রচার হইল, অমনি ত্বরিৎ-গতি এ সম্বাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইল। যেন মন্ত্রবলে কোনও এক মহাশক্তির মহাকর্ষণে সমগ্র নবদ্বীপস্থ মুসলমানপ্রপীড়িত হিন্দু একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিল ; আর অমনি অপরাহ্ন হইবামাত্র একে একে, দশে দশে, শতে সহস্রে লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দীপ ও তদুপযুক্ত তৈলাদি লইয়া প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাগিল। তখন মনোহর চিক্কণ বাস পরিধান করিয়া সুগন্ধি কুসুম-মাল্যে বিভূষিত হইয়া,

চন্দনচর্চ্চিত কলেবরে, মনোহর বেশে প্রভু গৃহ হইতে বাহির হইলেন, আর অমনি লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিধ্বনি উত্থিত হইয়া সসৈন্য কাজীর হৃদয় কম্পিত করিল। প্রভু সেই অসংখ্য নরশ্রেণীকে বহুতর ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া এক এক সম্প্রদায় গঠন করিয়া প্রত্যেকের এক এক গীত নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তখন সেই কোটী দীপালোকিত প্রেমাপ্লুত কীর্ত্তনরসে মত্ত জনসঙ্ঘ শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কাজী দমনে অগ্রসর হইলেন। কাজী এতাবৎ উদ্বিগ্ন হইলেও বিশেষ ভীত হয়েন নাই, কিন্তু যখন সেই অসংখ্য কণ্ঠের হরিধ্বনি ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন ও পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চক্ষু হইতে ঐ উজ্জ্বল আলোকে অল্পসংখ্যক মুসলমান কোথায় পলাইবে? সুতরাং যখন—

"আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজী বেটা কোথা?
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥"

তখন কাজী আর লুক্কায়িত থাকা বৃথা মনে করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দীনভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে শরণ লইল। তখন অক্রোধ শ্রীগৌরাঙ্গ লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিয়া কাজীকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে :—

"দূর হইতে আসে কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইল প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলেন আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলে এ ধর্ম্ম কেমত?"

তখন আশ্বাস পাইয়া কাজীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল এবং সাহস করিয়া

মিষ্ট কথায় নিমাইকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। আর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিমাইয়ের সহিত একটা কুটুম্বিতাও স্থাপন করিলেন। যথা চরিতামৃতে—

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তি হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

এই সকল বাক্যের পর কাজী আর এক অদ্ভুত কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, "যখন আমি মৃদঙ্গাদি ভগ্ন করিয়া হিন্দুর কীর্ত্তন নিবারণে প্রয়াস পাই, তখন একদিন গভীর নিশায় দেখিলাম, এক মহাভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্ত্তি মহাক্রোধে আমার বক্ষ বিদারণে উদ্যত হইয়া আমায় কীর্ত্তন ভঙ্গ করিতে নিষেধ করিলেন। এই দেখ, বক্ষে আজিও সেই সুতীক্ষ্ণ নখাঘাতক্ষত। সেই দিন হইতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, তুমিই সেই হিন্দুর সর্ব্বদেবাদিদেব নারায়ণ। অতএব তুমি আমায় কৃপা কর।" কাজীর এইরূপ সকরুণ আর্ত্তভাবে প্রভু তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে নিজজন জানিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন, আর বলিলেন যে, স্বীকার কর, আর কখন কীর্ত্তনে বাধা জন্মাইবে না। তখন—

"কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥"

এইরূপে প্রভু কাজীদমনপূর্ব্বক হরিধ্বনি দিয়া তাঁহার অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নবদ্বীপে নাম-মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে স্থাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অদ্যাপি ধুলোটের সময় কাজীর বাটীতে ধুলোট করিতে হয়। এই চাঁদ কাজীর কবর অদ্যাপি 'বল্লাল

ঢিপি' সন্নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক প্রশস্ত গোলক চাঁপার গাছ, এই কবরের উপর জন্মাইয়া কবরটীকে ছায়া ও পুষ্প প্রদানে সুশীতল রাখিয়াছে।

অলৌকিকতা।

এই অপূর্ব্ব ঘটনার পর হইতে গৌরহরির বাহ্যজ্ঞান ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিভোর থাকেন, আবার কখন আবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশনপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করেন। আবার কখন এইরূপ আবিষ্ট রহিয়াই কত অলৌকিক কার্য্য করিতে থাকেন। শ্রীবাসের মৃত পুত্রের প্রাণদান, সদ্যরোপিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে ফলোৎপাদন, সদ্য অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, স্পর্শমাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ প্রভৃতি কতশত অলৌকিক ব্যাপার এই সময় সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্তু সেই অলৌকিক প্রেমময় হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাসের নিকট এ সকলের মূল্য কি?

সোঽহং।

শ্রীনিমাইযের প্রধানতঃ দুইটী ভাব প্রকাশ পাইত। প্রথম ভক্তভাব, দ্বিতীয় ভগবদ্ভাব। যখন ভগবদ্ভাব প্রকাশ পাইত, তখন তিনি বিষ্ণু-খট্টায় যাইয়া উপবেশনকরিতেন, এবং 'মুঞি সেই' 'মুঞি সেই' বলিয়া ভক্তগণকে আশ্বাসিত করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে অলৌকিক তেজ বাহির হইত। সেই অমানুষিক দিব্যরূপ দেখিয়া ঋষিকল্প বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেন। তিনিও

ভক্তমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম-ভক্তি-দান করিতেন। আবার যখন ভক্তভাব প্রকাশ পাইত, তখন "হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ! তুমি কোথায় যাইলে?" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তখন তিনি তৃণাদপি সুনীচ, স্বহস্তে ভক্তের সেবা করিতেন, তখন তাঁহার আর্ত্তভাবে পাষাণও বিগলিত হইয়া যাইত। তাঁহার প্রেমাশ্রুতে ধরাতল ভাসিয়া যাইত। তাঁহার এই সকল অমানুষিক ভাব দেখিয়াই তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে প্রাণপ্রতিম জ্ঞান করিতেন; তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে ক্ষণ-কালের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইলে পুত্রশোক অপেক্ষাও তীব্রতর শোকানুভব করিতেন। যথা ভাগবতে:—

"চমকিত হ'য়ে সবে চারিদিকে চায়।
নিশি পোহাইল বলি কাঁদে উভরায়॥
কোটী পুত্র শোকেও এত দুঃখ নহে।
যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে॥"

প্রেমবৈকল্য।

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে চতুর্ব্বিংশতি মাত্র। আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কেবল মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। বয়ঃসন্ধিতে তাঁহার স্বাভাবিক কমনীয় কান্তি ও মাধুর্য্য শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়া তাঁহার লাবণ্য যেন একে-বারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা শচীদেবী পুত্রের এই অদ্ভুত বৈরাগ্য দর্শন করিয়া পাছে নিমাই সংসার ত্যাগ করে, এই দুঃসহ চিন্তায় ভীত হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া তিনি এই প্রেমোন্মত্ত যুবককে পুত্রবধূর রূপ-রজ্জুতে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীনিমাই নয়নের কোণেও এই

সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ললামভূতা লাবণ্যময়ী যুবতী ভার্য্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। যথা চৈতন্যভাগবতে :—

"লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলে অনুক্ষণ।
দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন॥"

এই সময়ে তাঁহার প্রেমবৈকল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার দেহ-চেষ্টাদিও তিরোহিত হয়, এমন কি দিবারাত্রির প্রভেদজ্ঞানও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়তা লাভ করেন। এই সময়কার অবস্থা বর্ণন করিয়া বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল।
ভাব নাম যত নাহি প্রকাশে সকল॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন।
রঘু-সিংহ, বুদ্ধ, কল্কী, শ্রীনন্দনন্দন॥
এই মত যত অবতার সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাবছল॥"

এইরূপ ভাবাতিশয্যে প্রভু তৎতৎভাবে আবিষ্ট হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, আবার তখনি বাহ্যজ্ঞান পাইয়া আপনি ভাবসম্বরণ করিতেছেন। আর "প্রাণ যায় প্রাণ যায়" রবে আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছেন। এই সময়ে আপনার রসে আপনি বিভোর হইয়া গৌরহরি জগৎসংসার, এমন কি স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ গোপিভাবে মুগ্ধ হইয়া ব্রজগোপিগণের গুণাবলী স্মরণ করিয়া "গোপী গোপী" বলিয়া জপ করিতেছিলেন, এমন

সময় একজন টোলের পড়ুয়া, কথিত আছে, সুবিখ্যাত আগম বাগীশ ঠাকুর, কোন যোগে প্রভুর নিকট আসিয়া এবং প্রভুকে তদবস্থায় গোপিনাম লইতে শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভাবাবেশ ও গভীর প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিলেন—

"গোপী গোপী কেন বল নিমাই পণ্ডিত ?
গোপী ছাড়ি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলহ ত্বরিত ॥
কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লইলে।
কৃষ্ণ নাম লইলে সে পুণ্য বেদে বলে ॥"

প্রভুর সে সময় বাহ্যসংজ্ঞা কিছুমাত্র ছিল না। প্রেমাবেশে তিনি ভাবিতেছেন যে, তিনি একজন ব্রজগোপী এবং প্রেমের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কৃষ্ণ তাঁহাকে কিছুতেই ধরা দিতেছেন না; কাজেই অভিমানে মানিনী হইয়া মনে করিতেছেন যে, আর সে নির্দ্দয়ের নাম লইব না, এখন হইতে আত্মত্যাগিনী, প্রেমময়ী গোপিগণের নামই জীবনের সার করিব। সেজন্য যখন বহিরঙ্গ পড়ুয়া আসিয়া গোপিনিন্দাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম লইতে বলিল, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া একগাছ যষ্টি লইয়া ঐ পড়ুয়ার প্রতি ধাবমান হইলেন। পড়ুয়াও তাঁহার আবেশভাব বুঝিতে না পারিয়া প্রহার ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তখন ভক্তবৃন্দ যাইয়া প্রভুকে শান্ত করিলেন। প্রভুও বাহ্যজ্ঞান পাইয়া, বহিরঙ্গের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

এদিকে নিমাই পণ্ডিত একজন পড়ুয়াকে প্রহার করিতে গিয়াছিলেন, একথা নগরে প্রচারিত হইলে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দৈত্যপ্রকৃতির যে জনকয়েক তাঁহার নিন্দক ছিলেন, তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিলেন। আর এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কিসে তাঁহারা সভক্ত নিমাইকে অপদস্থ

ও উৎপীড়িত করিবেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জগাই মাধাইয়ের দ্বারা কাজীর সাহায্যে এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র আত্মশক্তিতে যতদূর কুলায়, করিয়া দেখিয়াছেন, কিছুতেই প্রভুর এই প্রেমের বন্যায় বাধা দিতে পারেন নাই, তাহাতে এইক্ষণে এই এক নূতন ঘটনা পাইয়া বিষম গাত্রদাহে সোৎসাহে তাঁহারা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। যথা :—

"কেহ বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে?
কৃষ্ণ হেন নামও না বলে যে বদনে॥
কেহ বলে শুনিলেম অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র গোপী গোপী নাম॥
কেহ বলে এতবা সম্ভ্রম কেন করে?
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরে॥
তিনি সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি?
তিনি মারিতে বা আমরা কেন সহি?"

এইরূপে প্রভুর বিপক্ষে নবদ্বীপে তাঁহারা এক মহা আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের শ্রীনিমাইয়ের প্রতি এরূপ কোপের কারণ একমাত্র হিংসা এবং তাঁহার বিপক্ষে বলিবার একমাত্র কথা এই, যথা ভাগবতে —

"হের সবে পড়িলাম কালি যার সনে।
আজি তিনি গোসাঞি বা হইল কেমনে?"

"কাল যাহাকে সমান জ্ঞানে এক সাথে বিদ্যাভ্যাস ও বিহারাদি করিয়াছি, সে আজ কেন আমাদের মত না থাকিয়া অমিততেজা, অদ্ভুত ক্ষমতাশালী হইবে? আমার শক্তি নাই যে আমি আত্ম-চরিত্র বলে উহার মত হই, কিন্তু নিন্দা করিয়া, মিথ্যা উহার দোষ গান

করিয়া উহাকে লোক-চক্ষে অপদস্থ করিবার ক্ষমতা ত আমার আছে।” এই যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কতিপয় ব্যক্তি প্রভুর গ্লানি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে এই সকল নিন্দাবাদ প্রভুর কর্ণেও প্রবেশ করিল। বিশেষতঃ এই সময়ে একটী ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বুঝিলেন যে, তাঁহার এই সাংসারিক সুখ, লৌকিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ঐ নিন্দকগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। ঘটনাটী এই—যথা চরিতামৃতে ঃ—

“আর এক বিপ্র আইলা কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট না পাইল ভিতরে যাইতে ॥
ফিরে গেলা ঘরে বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে বলে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥
শাপিব তোমারে মুই পাঞাছি মন দুখ।
পৈতা ছিড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥
সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥”

সন্ন্যাসের সংকল্প।

প্রভু হাস্যমুখে অবনতমস্তকে ঐ দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণের ভয়ঙ্কর শাপ গ্রহণ করিলেন এবং এতদিনে স্পষ্ট বুঝিলেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি কি চায়। আর তাহাই বুঝিতে পারিয়া করুণাময় প্রভু ঐ নিন্দকগণের প্রীতির জন্য সংসারত্যাগ বাসনা করিলেন। কেহ কেহ বিচার করেন যে, দীনদয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশে প্রেম বিলাইতে, বিশেষতঃ

বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ী ও সন্ন্যাসীগণের সান্নিধ্যলাভ করিতে এবং মূর্খগণের মন হইতে বিদ্বেষভাব দূর করিতে এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন।

শ্রীনিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখনও চতুর্ব্বিংশতির সীমা উল্লঙ্ঘন করে নাই। এই নবীন বয়সে প্রভু এই দারুণ সংকল্প স্থির করিয়া একদিন নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া নিজের নিদারুণ সংকল্প ব্যক্ত করিলেন, এবং এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে নিত্যানন্দ অধীর হইলে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া নানামতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন। এইরূপে একে একে তদ্গতচিত্ত, রোরুদ্যমান গদাধরাদি সঙ্গিগণকে প্রবোধ দিয়া ও সকলকে বুঝাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সন্ন্যাসের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, যথা ভাগবতে—

"এইমত আরও আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবে মহাসুখে আমাসঙ্গে॥"

প্রভু যদিও সখা ও অন্তরঙ্গসঙ্গিগণদের নিকট হইতে অনুমতি লইলেন বটে, কিন্তু স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী ভার্য্যার নিকট কিরূপে এই নিদারুণ সংবাদ ব্যক্ত করিবেন, ও কি বলিয়া তাঁহাদের প্রবোধ দিবেন, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কোন কথা না বলিয়া যদি সন্ন্যাসী হয়েন, তবে শোকে দুঃখে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহাও বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে একদিন মাতৃসকাশে মনোগত কথা ব্যক্ত করিলেন। এই নিদারুণ কথা শুনিবামাত্র বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় পুত্রগতপ্রাণা শচীদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। জননীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া গৌরাঙ্গ ত্বরায় শ্রীহস্তস্পর্শে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং বহু প্রবোধ দিয়া এবং মাতাকে আপনার স্বরূপ দেখাইয়া

ও সন্ন্যাসগ্রহণে দার্ঢ্য জানাইয়া মাতার অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রবোধচ্ছলে কহিলেন। যথা ভাগবতে :—

"আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥
অমায়ায় এই সব কহিলাম কথা।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বদা॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সন্ন্যাসে সম্মতি।

এখন মাতার নিকটও সম্মতি পাইলেন, রহিলেন কেবল দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। দেবী মাতাপুত্রের কথা কতক কতক শুনিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাকী ছিল না। তাই সেদিন শীঘ্র শীঘ্র গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রিতে শোকাকুল হৃদয়ে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্যদিন শয্যায় আসিয়া দেখেন, স্বামী ধ্যানমগ্ন অথবা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় আছেন। আজ দেখিলেন, তিনি নিদ্রাগত। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে, অতি ধীরে, পালঙ্কে উঠিয়া তাঁহার পদতলে বসিলেন, আর অনিমেষ নয়নে সেই অমানুষিক দেবদুর্লভরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, তাহাতে আর স্থির রহিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ফুল্লারবিন্দলাঞ্ছিত পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাহা চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই বিমল সুখের মধ্যে যেমন মনে হইল যে, এসুখ তাঁহার স্থায়ী হইবে না, অমনি

দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পতিত হইয়া গৌরের চরণযুগল অভিষিক্ত করিল। সেই উষ্ণ জলস্পর্শে গৌরের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রাণাধিকা দেবীকে তদবস্থা দেখিয়া একেবারে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন ও সোহাগে আদরে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু সরলতার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভগ্নহৃদয়ের নীরব উচ্ছ্বাসে তাঁহার সমস্ত আদর সোহাগ ভাসিয়া গেল। দেবী কথা কহিতে ইচ্ছা করিলেও ভাবাধিক্যে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল। পরে বহুযত্নে বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি নাকি সংসার ত্যাগ করিবে, কেন? তার প্রয়োজন? তোমার সংসার ত আমি, তা আমায় কেন চিরকালের মত আমার পিতৃগৃহে রাখিয়া তুমি এই গৃহে বাস করনা! তোমার পায়ে ধরি, তুমি অন্যমত করিও না; আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নাই, তোমার জন্যই আমার বড় ভয়, এই নবনীত কোমল দেহে সন্ন্যাসের কঠোর দুঃখ কেমন করিয়া সহ্য করিবে? আর একবার মার কথা ভাবিয়া দেখ, তিনি যে তোমার বিহনে এক মুহূর্তও বাঁচিবেন না" ইত্যাদি বাক্যে একেবারে স্বামীকে বিহ্বল করিয়া ফেলিলেন। তখন ধূর্তশিরোমণি শ্রীনিমাই সাংসারিকভাবময় ভাষায় কোন ফল হইবে না, দেখিয়া আধ্যাত্মিক ভাব আনয়ন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এ জগতে পতি কে? কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই পতি সেই শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র পুরুষ, যথা চৈতন্যমঙ্গলে:—

"কি নারী পুরুষ দেখ সবার সে আত্মা এক
মিছা মায়া বন্ধ ভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি আর যে সব প্রকৃতি
একথা না বুঝে মাত্র কেই॥"

অতএব সেই পরম পুরুষকেই পতিরূপে বরণ কর। তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলে সে প্রেমে বিরহ বিচ্ছেদ কিছুই আসিবে না।

সেই অপার্থিব প্রেমের সমান প্রেম আর নাই। আমি সেই প্রেমে পাগল হইয়াছি। আমার প্রতি তাঁহার আদেশ অন্যরূপ, আমি তজ্জন্য কিছুতেই গৃহে রহিতে পারিতেছি না—তাহাতেই তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। মার অনুমতি পাইয়াছি, এখন তুমি অনুমতি দিলেই হয়।" এত যে বলিতেছেন, সে কথা কে শুনিতেছে? যাঁহাকে বলিতেছেন, তিনি তখন মূর্চ্ছাগতা; সেজন্য শ্রীনিমাই আস্তে ব্যস্তে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিয়া কত মতে প্রবোধ দিলেন এবং পরিশেষে আত্মপ্রকাশ করিয়া সন্ন্যাসে তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইলেন বটে, কিন্তু তিনি সেই নিশিতেই যে গৃহত্যাগ করিবেন, একথা একবারও ব্যক্ত করিলেন না, বরং অন্য নিশাপেক্ষা এ নিশায় বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত অধিকতর প্রফুল্লচিত্তে আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

গৃহত্যাগ।

গভীর নিশায় যখন সকলে ঘুমে অচেতন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া নিদ্রিতা পত্নীর সরলতামাখা মুখচন্দ্র সস্নেহে অবলোকন করিয়া এবং উদ্দেশে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিচ্ছেদে নদীয়ার ভক্তগণের মধ্যে যে শোকের বন্যা আসিয়াছিল. তাহা বর্ণন করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

সন্ন্যাস-গ্রহণ।

১৪৩১ শক (১৫১৯ খৃষ্টাব্দে) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির গভীর নিশায় মাঘের দারুণ শীত অবহেলা করিয়া সন্তরণে গঙ্গাপার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির।

শ্রীধাম পুরীর এই শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার বহু কাল গত হইয়াছিল। তিনি মন্দির-অভ্যন্তরে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গৃহ-ভিত্তিতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক এক দৃষ্টিতে তন্ময় হইয়া চিন্ময় বিগ্রহ দর্শন করিতেন। অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া প্রত্যহ যে স্থানে শ্রীপদ রক্ষা করিয়া দাঁড়াইতেন ও মন্দির-গাত্রে যথায় হস্তার্পণ করিতেন, ঠিক সেই স্থানে প্রস্তর ক্ষয় পাইয়া শ্রীপদের চিহ্ন ও মন্দির-গাত্রে অঙ্গুলিপাতের চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীপদের ঐ চিহ্নখানি বহু যত্নে মন্দির-অভ্যন্তর হইতে তুলিয়া শ্রীমন্দিরের বাম পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মন্দির-গাত্রে অঙ্গুলিপাতের চিহ্ন অদ্যাপি সুস্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে।

কাঞ্চন নগরে (কাটোয়ায়) উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশব ভারতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুদিন পূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিমাই তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন; সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার সংকল্প বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল। সমগ্র কাটোয়ায় এই সময়ে এক মহাকর্ষণ আরম্ভ হইল এবং দলে দলে স্ত্রী পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে এবং ভারতী গোসাঞিকে বেষ্টন করিতে লাগিল এবং এই নবীন সুন্দর পুরুষটীকে সন্ন্যাসী হইতে না দেওয়া সকলেরই চেষ্টা হইল। তাঁহারা স্নেহের ও মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া "কিরূপে এই কোমল শরীরে সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম সহ্য করিবেন" ভাবিয়া সকলে আকুল হইলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য ও ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া মহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সহিত কাটোয়ায় মিলিত হইলেন। ভারতী ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ এবং সমবেত অসংখ্য জনগণ কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে এই দারুণ সংকল্প পরিত্যাগের জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গৌরের দার্ঢ্য দেখিয়া পরিশেষে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গ, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি বিধিযোগ্য সমস্ত আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন। পরে সমুদায় আয়োজন শেষ হইলে শুভসংক্রান্তিতে যখন গৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডনের জন্য ক্ষৌরকারকে আহ্বান করা হইল, তখন সেই নরসুন্দর প্রভুর অলৌকিক রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শে সাহস করিল না। পরে প্রভুর নিকট আশ্বস্ত হইয়া ও বর পাইয়া সেই শোকাবহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। যথা ভাগবতে :—

"তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥

নাপিত আসিল বসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে ॥
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় সে ক্রন্দন মাত্র করে ॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সব করেন ক্রন্দন ॥
ভক্তের কি ছার যত ব্যবহারিক লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিল করি শোক ॥"

এইরূপে সেই মুহূর্ত্তে সেখানে শোকের ও ক্রন্দনের এক মহারোল উত্থিত হইল। প্রভু ক্ষৌরকার্য্য সমাধান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া ভারতীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "আমি স্বপ্নে এক মন্ত্র পাইয়াছি, আপনি উহা শ্রবণ করুন," এই বলিয়া অগ্রে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিয়া পরে সেই মন্ত্রই ভারতীর নিকট হইতে স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার পর ভারতী তাঁহার কি নাম রাখিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই দৈববাণী হইল, তখন—

"পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী।
প্রভুবক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি ॥
যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বলাইলা।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা ॥
এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হ'তে যাতে হ'ল ধন্য ॥"

এইরূপে প্রভুর আর এক "জগন্মঙ্গল" নাম হইল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। ✓

নীলাচল-যাত্রা।

দীক্ষার পর প্রভু প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিন দিনে তিনি কিছুমাত্র পথও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কেবল এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ বিচার করেন যে, নবদ্বীপে শচীমাতা "হা বাপ! হা নিমাই!" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া "হা নাথ, হা মদনমোহন!" বলিয়া এবং ভক্তগণ "হা প্রভু!" বলিয়া ডাকিতেছে। এক্ষেত্রে ভক্তাধীন শ্রীপ্রভুর সহসা অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না; সেজন্য সহসা তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। প্রভু চলিতেছেন, আর অসংখ্য ব্যক্তি প্রভুর অনুসরণ করিতেছে। প্রভু ক্ষণে ক্ষণে বাহ্যজ্ঞান পাইয়া ঐ অসংখ্য ব্যক্তিকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিয়া তাহাদের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহারাও প্রভুর কৃপায় মহিমান্বিত হইয়া যে স্থানে গমন করিতেছেন, সে স্থানে নাম কীর্ত্তন করিয়া প্রেম-প্লাবন আনয়ন করিতেছেন। এই-রূপে সমগ্র রাঢ়দেশ এক অপূর্ব্ব প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিল। প্রভু দ্বাদশ দিন ধরিয়া বৃন্দাবন-অভিমুখে পশ্চিমদিকে গমন করিতেছেন, কিন্তু অকস্মাৎ গতি পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিত্যানন্দাদি সহচরগণও প্রভুকে নবদ্বীপাভিমুখে গতি পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া মহাহ্লাদে এই শুভ সংবাদ দিতে আচার্য্যরত্নকে অবিলম্বে নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। প্রভুও কিয়দ্দিবস পথে পথে হরিনাম-নিধি বিলাইয়া প্রথমে ফুলিয়ার হরিদাসের আশ্রমে, পরে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া অতি

নিকটেই আসিয়াছেন শুনিয়া, ভক্তবৃন্দ, এমন কি তাঁহার পূর্ব্ব নিন্দকগণও প্রভুকে দেখিতে ফুলিয়ায় ও শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। অসংখ্য লোক আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দর্শনে গমন করিতে লাগিলেন। তখন পথে, ঘাটে এক মহা জনতা উপস্থিত হইল, ঘাটে খেয়াদার আর নৌকা যোগাইতে পারিল না, তখন অনেকে ঘট বুকে বাঁধিয়া সন্তরণে গঙ্গাপার হইয়া ফুলিয়ার দিকে ছুটিয়া চলিল।

এইরূপে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইল। ক্রমে নদীয়া হইতে শ্রীবাসাদি ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া শচীমা, অদ্বৈত-মন্দিরে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে পাইয়া প্রেমাবেশে রসময় মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা—

"সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমন অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥"

তখন সমস্ত শান্তিপুরে এক হরিবোল ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। সেই সংখ্যাতীত ভক্তকণ্ঠে তখন শান্তিপুর মুখরিত। কবির কথায়, তখন প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।"

এই আনন্দ-নৃত্যে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্রভু, মাতা ও ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচল-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে সমগ্র নদীয়ায় এবার যে মহাশোকের ব্যাত্যা প্রবাহিত হইল, তাহা অননুমেয়। তবে প্রভুর কৃপায় সে যাত্রা তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা

হইল। বিশেষতঃ, প্রভু তাঁহাদের আশান্বিত করিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁহারা নীলাচল গমন করিবেন ও মধ্যে মধ্যে তিনিও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এখানে আগমন করিবেন, এই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়াই তাঁহারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ।
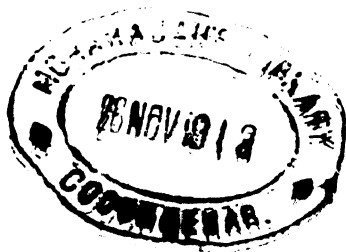
অন্ত্যলীলা।

নীলাচল-চন্দ্রের ইন্দুবদন দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া, সর্ব্ববাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া প্রভু ছত্রভোগ* পথে অগ্রসর হইলেন। তখন বাঙ্গলার যবন অধিপতি হুসেনসাহের সহিত কটকের রাজার যুদ্ধ চলিতেছিল এবং কটকের পথে স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুঁতিয়া পথিকগণকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল; কারণ ঐ প্রদেশে অরাজকতা হওয়ায় পথ, ঘাট, বিশেষ বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল। কিন্তু কোন বাধা বিপত্তিই নবদ্বীপ-চন্দ্রের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার সমভিব্যাহারী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দদত্ত এই চারিজনকে লইয়া স্বচ্ছন্দে রেমুণায় উপস্থিত হইলেন। তথায় ক্ষীরচোর গোপীনাথের অপূর্ব্ব ভক্ত-বাৎসল্যের

---

* ছত্রভোগ—বর্ত্তমান ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্ব্বর্ত্তী জয়নগরের সন্নিহিত মথুরাপুর থানার অধীনে একটী গ্রাম। শ্রীপ্রভু নীলাচল যাইতে এক রাত্রি এখানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে অম্বুলিঙ্গ নামে এক শিব ছিলেন। যে ঘাটে তিনি স্নান করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি তীর্থরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে।

পবিত্র গাথা শ্রবণ করিয়া প্রভু আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। রেমুণায় প্রেমানন্দে রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহারা রেমুণা ও কটকের মধ্যবর্ত্তী স্থান যাজপুরে শ্রীবরাহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া পরে শ্রীসাক্ষী-গোপাল দর্শনে গমন করিলেন।

দণ্ডভঙ্গ।

পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গনদীতে স্নান দানাদি সমাধাপূর্ব্বক নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর দর্শন করিতে গমন করিলেন। শ্রীপাদ প্রভুর অজ্ঞাতসারে এই স্থানে তাঁহার সন্ন্যাসের চিন্ ও সম্বল দণ্ডখানিকে ভগ্ন করিয়া নদীজলে ভাসাইয়া দিলেন, আর তদবধি সেই নদীর নাম হইল দণ্ডভাঙ্গা নদী। কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার চলিলেন। নিত্যানন্দ যে তাঁহার দণ্ডভঙ্গ করিয়াছেন, তখন সে তথ্য তিনি আদৌ লইলেন না। কমলপুর হইতে কিয়দ্দূর যাইতেই পুরীর শ্রীমন্দিরের চূড়া সকলের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল, আর সেই এতদিনের অভীষ্ট বস্তু দর্শনে মহাপ্রভু ভাবাবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। যথা ভাগবতে—

> "অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
> বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব দেহ-ভার॥
> প্রাসাদের দিকে প্রভু চাহিতে চাহিতে।
> চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥"

সে শ্লোকটী এই—

> "প্রসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃস্মের বক্ত্রারবিন্দো,
> মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপাল মূর্ত্তিঃ।"

প্রভু দেখিলেন যে, এত আকাঙ্ক্ষার, এত কষ্টের এত সাধনের ধন এত দিনে ঐ সম্মুখে দেখা যাইতেছে, তখন মনে হইল, তবে বুঝি এত দিনে প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইলাম, কারণ ঐ শ্রীমন্দিরের চূড়া, আর অল্প দূর গমন করিলেই শ্রীমন্দিরে প্রাণনাথের সহিত মিলিত হইব, তাই চূড়ার অগ্রভাগ দর্শন-মাত্রে প্রভু বিহ্বল হইলেন। আবার যখন দেখিলেন, সেই প্রাসাদাগ্রভাগ হইতে নীলকান্তমণিলাঞ্ছিত একটী সুন্দর শিশু বাল-গোপাল মূর্ত্তিতে তাঁহাকে হাস্যচ্ছলে আহ্বান করিতেছেন, তখন তিনি পুলকাধিক্যে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকালপরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মন্দির-অভিমুখে ছুটিলেন, কিন্তু প্রেমাতিশয্যে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া স্খলিতপদে প্রভুর গমনহেতু কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র, এই তিন ক্রোশ পথ আসিতে তাঁহাদের বহু বিলম্ব হইল। পুরীর সীমায় আঠার নালায় আসিয়া যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন দিবা দ্বিপ্রহর। এই আঠার নালায় আসিয়া মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিলেন, এবং নিত্যানন্দের নিকটে তাঁহার দণ্ড ফিরিয়া চাহিলেন। নিত্যা-নন্দ ও অন্য সকলে এতাবৎ এই দণ্ডভঙ্গের নিমিত্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে একটী অনর্থের সম্ভাবনা করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রভু কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ সর্ব্ব অপরাধ স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তজ্জন্য শাস্তি প্রার্থনা করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দবাক্যে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া পরে ঈষৎ কৃত্রিম ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা আমার যেরূপ হিতৈষী, তাহা বুঝা যাইতেছে, আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিলাম, ভরসার মধ্যে ছিল, এক গাছি দণ্ড, তাহাও তোমরা রাখিতে দিলে না। অতএব আমি আর তোমাদের সহিত গমন করিব না, হয় তোমরা অগ্রে যাও, নয় আমাকে যাইতে দেও।" প্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুকুন্দদত্ত, বলিলেন "প্রভু তুমিই অগ্রে গমন

কর, আমরা পরে যাইব।” তাহাই প্রভুরও মনের অভিলাষ। এখন সঙ্গীগণের অনুমতি পাইয়া—

“মত্ত সিংহ গতি জিনি চলিল সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর॥”

পুরী-প্রবেশ।

পুরী-প্রবেশ করিয়া প্রভু চকিতের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, আর সেই চিরবাঞ্ছিত, চিরঅভিলষিত, চিরপ্রিয়, সাধনের ধনকে

“ দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবারে॥ ”

ইচ্ছামাত্র লম্ফ দিয়া যেমন শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন, অমনি প্রেমবিহ্বল-হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে সেই সময় ভুবন বিখ্যাত, নদীয়ার পণ্ডিতকুলগৌরবরবি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্বপ্রেমবিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রভুকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন, তদ্ধেতু যত্নপূর্ব্বক জগন্নাথের পরিবারগণ দ্বারা বহন করাইয়া প্রভুকে আপনার বাসভবনে লইয়া আসিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বাসুদেব কটকের রাজা প্রতাপরুদ্রের ঐকান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধায় বাধ্য হইয়া তখন পুরীতে বাস করিতেছিলেন। পুরীতে তখন তিনি দ্বিতীয় রাজার ন্যায় সম্মানিত। তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণার্থ তখন দূর দূরান্তর হইতে শত শত ছাত্র আসিয়া পুরীতে বাস করিতেছিল। বিশেষতঃ, তিনি বেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া অনেক দণ্ডী তখন কাশীতে না যাইয়া তাঁহার নিকট

বেদ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ রূপলাবণ্যে এবং অলৌকিক প্রেম-বিকার দর্শন করিয়া মহা পুরুষজ্ঞানে সার্ব্বভৌম এতাবৎ তাঁহার শুশ্রূষায় রত ছিলেন। পরে যখন নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের মুখে প্রভুর পূর্ব্ব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিজের পরমাত্মীয় জানিতে পারিলেন, তখন সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনের প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু যখন সর্ব্ব যত্ন বিফল হইল, তখন—

"উচ্চ করি করে সবে নাম সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হ'ল প্রভুর চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি॥"

প্রভু চৈতন্য পাইয়া প্রথমে সঙ্গীগণকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, সার্ব্বভৌমের ঐকান্তিক আগ্রহে সে দিন সপরিবার তথায় প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিয়া অবস্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম তখনকার ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক কাশীবাসী প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী ব্যতীত আর সকলের শীর্ষ-স্থানীয়। একমাত্র প্রকাশানন্দই তাঁহার সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়েই শাস্ত্র—ন্যায় ও বেদান্ত লইয়া এত মুগ্ধ যে, প্রেমভক্তি বা বিশ্বাসের বলে যে কখন প্রেমময় ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, একথা তাঁহাদের নিকট নিতান্ত প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইত।

সার্ব্বভৌম-মিলন।

যদিও প্রভুর বিধুবদন দর্শনে ও তাঁহার মধুর সংসর্গে সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে এক মহা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পার্থিব মায়ায় মুগ্ধ থাকায়, ও সংসারে সমধিক লিপ্ত বিধায়, গর্ব্ব, দম্ভ, এ সকল তখনও তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বালক হইলেও সন্ন্যাসী বিধায় সার্ব্বভৌমের পূজনীয় ও প্রণম্য; কিন্তু এই পরমাত্মীয় নবীন সন্ন্যাসীটীকে পূজা ও অর্চ্চনা করিতে তাঁহার আত্ম-গরিমায় যেন আঘাত করিতে লাগিল—সুতরাং এক দিন শ্রীচৈতন্য-দেবকে নির্জ্জনে পাইয়া অন্যান্য বহু কথার পর কহিলেন, "দেখ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি সুবুদ্ধি হইয়া এই নবীন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণরূপ অতি কঠোর কর্ম্ম কেন করিলে? জননী, ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলে কি লাভ হয়? বরং গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রণাম করেন, তাহাতে প্রত্যবায় আছে। যদিও মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি অনেকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই শেষ জীবনে যখন ঔদ্ধত্য নষ্ট হইয়াছে, তখনই এই কঠোর পথের পথিক হইয়া-ছেন;" সার্ব্বভৌমের এবম্বিধ বাক্যে বিনয়ের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এই উত্তর করিলেন, "আপনি আমাকে তদ্রূপ সন্ন্যাসী মনে করিবেন না; আমি কৃষ্ণবিরহে পাগল হইয়া সংসারে রহিতে পারি নাই, আর অভিমান দূর করিবার জন্যই শিখা সূত্র ত্যাগ করিয়াছি। আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত, শিষ্যানুশিষ্য। আমি জ্ঞানহীন বালক, আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে শিক্ষা দান করুন, আর এক্ষণে কিসে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা হয়, আর সংসারমায়ায় মুগ্ধ হইতে না হয়—তাহারই উপদেশ দান করুন। তখন—

"ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে।
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে॥
এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাখ্যান।
সাত দিন করেন প্রভু বসিয়া শ্রবণ॥

এইরূপে প্রভু নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সাত দিন বেদান্ত-বাখ্যা শ্রবণ করিলেন; কিন্তু ভাল মন্দ একটী কথাও কহিলেন না। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে কৃষ্ণচৈতন্য! অদ্য সপ্তাহকাল তুমি বেদান্ত শ্রবণ করিতেছ; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে একটি প্রশ্নও করিলে না, ইহার অর্থ কি?" তাহাতে মহাপ্রভু উত্তর করিলেন, "ব্যাস-সূত্রের অর্থ আমি উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। কিন্তু আপনি যে উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করিতেছেন, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥"

প্রভু যখন এইরূপে মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের বাখ্যায় দোষারোপ করিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে এবিষয় লইয়া এক মহাবাক্যবিতণ্ডা উপস্থিত হইল। অদ্বিতীয় পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপনার অসীম পাণ্ডিত্যবলেও যখন কোনও রূপে আত্মমত স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন শ্রীচৈতন্য ধীরকণ্ঠে, প্রবোধচ্ছলে সার্ব্বভৌমকে বলিলেন,"আপনি যে বিদ্যায় পারদর্শী, তাহাতে সেই প্রেমময় ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ, তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহাতে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভক্তি-স্থাপনা করিতে হয়। ধর্ম্ম বলুন, জ্ঞান বলুন, এ সকলের যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে ভগবানে প্রেম ও ভক্তি।

আত্মারাম মুনিগণ ও যাঁহারা সর্ব্ব বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই প্রেমময় ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ১৪ স্কন্ধে ৭ম অধ্যায় ১০ম শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি সূতবাক্যের শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন;—

"আত্মারামশ্চ মুনয়োনিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিত্থং ভূতগুণোহরিঃ॥"

সার্ব্বভৌম এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভুকে উহার অর্থ করিতে বলিলে, প্রভু বলিলেন, "আপনি মহাপণ্ডিত, আপনিই অগ্রে উহার অর্থ করুন, পরে আমি যাহা জানি বলিব।" তখন সার্ব্বভৌম আপনার অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য-বলে ঐ শ্লোকটীর নয় প্রকার অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিলেন, যখন সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তিনি কহিলেন, "আপনি এই আত্মারাম শ্লোকের যে বহু প্রকার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা কেবল আপনাতেই সম্ভব, অন্যত্র এই পাণ্ডিত্য দুর্লভ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্লোকটীর যেটী আসল তাৎপর্য্য, তাহা আপনি আদৌ গ্রহণ করেন নাই;"—এই বলিয়া তিনি স্বয়ং ঐ শ্লোকটীর সার্ব্বভৌমকৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত অষ্টাদশ প্রকার নূতন অর্থ করিলেন এবং সকল গুলিরই "ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ" এই তাৎপর্য্য করিলেন।

সার্ব্বভৌম-বিজয়।

প্রভু ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর সার্ব্বভৌম মহাশয় বিস্মিত এবং ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, এ বস্তুটী কি? যথা;—

"অথৈষবিস্ময়মনা দ্বিজাগ্রণী হৃদাহৃদি ব্যাকুলিতং জগাদ।
ক এষ মৎপ্রতিভ খণ্ডনার্থ মিহাবতীর্ণঃ কিমু গীষ্পতিস্যাৎ॥

ইনি কি বৃহস্পতি! আমার প্রতিভা হরণে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অথবা এটী তাঁহা হইতে বড় আর কিছু, এইরূপ ভাবিতেছেন, আর নির্ব্বাক হইয়া শ্লোকের অপূর্ব্ব অর্থ শ্রবণ করিতেছেন। দয়াল প্রভুও এইরূপে ভাগ্যবান ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্য-অভিমান হরণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিতে মনন করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"নিজরূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন॥
দেখাইলে তারে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করে পড়ি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥

সার্ব্বভৌম প্রভুর এই আত্মবিকাশ দেখিয়া প্রথমে প্রণাম করিলেন বটে, কিন্তু সেই তেজোময় অপূর্ব্ব রূপের দিকে অধিকক্ষণ দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। যথা ভাগবতে—

"অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটী সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥"

এইরূপে মায়াবাদী সার্ব্বভৌম অগাধ অনন্ত গৌরাঙ্গ-প্রেমসিন্ধুতে ভাসিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"সার্ব্বভৌম হইলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম॥"

ভারতের তদানীন্তন পণ্ডিতশিরোমণি সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গে অপার করুণার কণামাত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং মহাপ্রভু কি বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা আমাদের ন্যায় পাতকী দুর্জ্জনের বিদিতার্থ স্বয়ং শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরগাত্রে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

ভাগ্যবান সার্ব্বভৌম যে কেবলমাত্র প্রভুর ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর রূপ, ধ্যান প্রভৃতি বর্ণন করিয়া একখানি অদ্ভুত গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং বিলসতি নিরবধি ভাব বিদেহং।
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
অরুণাম্বর ধরং সুচারু কপোলং ইন্দুবিনিন্দিত নখচয়রুচিরং।
জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং ভূষণ নবরস ভাব বিকারং।
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
চঞ্চল চারু চরণগতি রুচিরং মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং তং প্রণমামিচ শ্রীশচীতনয়ং॥
ভূষণ ভূরজ অলকা বলিতং কম্পিত বিম্বাধর বর রুচিরং।
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
নিন্দিত অরুণ কমল দল নয়নং আজানুলম্বিত শ্রীভুজ যুগলং।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তক বেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
নব গৌরবরং নব পুষ্প শরং নবভাব ধরং নবোল্লাস্য পরং।
নব হাস্যকরং নব হেম বরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নব প্রেমযুতং নবনীত শুচং নববেশ কৃতং নবপ্রেম রসং।
নবধা বিলাসং সদা প্রেমময়ং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥

সিদ্ধ বকুল।

কাশীমিশ্রের উদ্যানস্থিত এই অলৌকিক [illegible] সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইহা শ্রীপ্রভুর স্বহস্তরোপিত দন্তধাবন কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন বলিয়া খ্যাত। ইহারই তলায় বসিয়া ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ জপ করিতেন ও শ্রীমান মহাপ্রভু প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে এখানেই দর্শন দিতেন। দৃষ্টিমাত্রেই ইহার অলৌকিকত্ব অনুভূত হয়।

হরিভক্তি পরং হরিনাম ধরং কর জপা করং হরিনাম পরং।
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নিজ ভক্তি করং প্রিয় চারুতরং নট নর্ত্তন নগরী রাজকুলং।
কুলকামিনী মানসোল্লাস্য করং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং মৃদঙ্গ ররাব সুবীণা মধুরং।
নিজ ভক্তি গুণাবৃত নাট্য করং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
যুগধর্ম্ম যুতং পুন নন্দসুতং ধরণী সুচিত্রং ভব ভাবোচিতং।
তনুধ্যান চিত্রং নিজবাস যুতং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
অরুণ নয়নং চরণ বসনং বদনে স্খলিতং স্বনাম মধুরং।
কুরুতে সুরসং জগতো জীবনং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥"

এইরূপে পণ্ডিতকুলরবি সার্ব্বভৌম বিজিত হইলে ক্রমে বহু সন্ন্যাসী, দণ্ডী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্ব্বিচারে গৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৃদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর দাসমধ্যে পরিগণিত হইলে, তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে আর কাহারই বিচারের সুযোগ হইল না।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ।

নীলাচলে দুইমাস প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইলে পর—শ্রীগৌরাঙ্গদেব একদিন দক্ষিণাঞ্চল গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।* ভক্তগণ প্রভুর সহিত ভাবী বিরহ মনে

* শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্নরূপ লিখিত আছে, তবে মূলতঃ প্রমাণের পর সমস্ত গ্রন্থেই একরূপ নির্দ্দেশ আছে, একজন যে গ্রামের নামোল্লেখ ও যে অলৌকিক অপূর্ব্ব ঘটনা অন্তরস্থ করিয়াছেন, অপরে তাহা না করিয়া অপর গ্রামের প্রভুর অন্য কোন ঐশীশক্তির অবতারণা করিয়াছেন। গ্রাম

করিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন এবং সকলে সমভিব্যাহারী হইতে মনস্থ করিলে প্রভু তাঁহাদিগকে নানামতে প্রবোধ দিয়া এবং শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবেন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একমাত্র কৃষ্ণদাস নামক এক ভক্তিমান বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৪৩২ শকের বৈশাখমাসে (১৫১৯ খৃঃ অঃ) দাক্ষিণাত্য উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু! আমার একটি অনুরোধ আছে। গোদাবরী-তটে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় নামক একজন বিশুদ্ধাত্মা বৈষ্ণব আছেন। যদিও তিনি সংসারী ও রাজমন্ত্রী, তথাপি সেরূপ রসজ্ঞ, উচ্চাধিকারী ব্যক্তি আমার চক্ষে দৃষ্টি পড়ে নাই, আমি অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এতাবৎ তাঁহাকে উপহাস করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আপনার কৃপায় বুঝিতেছি, তিনি কি বস্তু, অতএব আমার একান্ত অনুরোধ; আপনি তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তখন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কেল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥

বলিয়া অবস্থান-সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞানও ছিল না, তাহা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥
সে সব তীর্থের গ্রাম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থ গমন হয় ঘোরাফিরি॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গমন।
বাহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥"

এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাই পড়িল সার্ব্বভৌম॥"

এইরূপে নীলাচল হইতে বিদায় হইয়া মহাপ্রভু মত্ত সিংহপ্রায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতেছেন, আর প্রেমে বিভোর হইয়া শ্রীমুখে উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, যথা—

"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষমাং॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহিমাং॥
রামরাঘব! রামরাঘব! রামরাঘব! রক্ষমাং।
কৃষ্ণকেশব! কৃষ্ণকেশব! কৃষ্ণকেশব পাহিমাং॥"

এই সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ সুশীতল ও আশ্বাসিত হইল। প্রভু, কখন নাম করিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন, আর সম্মুখে যাহাকে পাইতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন "ভাই হরি বল।" কাহাকে বা সেই সুদীর্ঘ ভূজে গ্রহণ করিয়া সুবিশাল বক্ষে আলিঙ্গন করিতেছেন। আর সেই আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেন কোন মন্ত্রবলে প্রেমে মত্ত হইয়া "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতেছে, আবার অন্য যে কেহ ঐ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেছে, তাহারও ঐ দশা হইতেছে। এইরূপে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম অল্পদিনে সমগ্র দক্ষিণাত্যে সংক্রামিত হইয়া গেল। তিনি যে স্থান দিয়া গমন করিলেন, তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ বহুদূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়া গেল। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"এই শ্লোক পথে পড়ি চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥

সেই লোক প্রেমমত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভু পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তিসঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ ব'লে হাঁসে কাঁদে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈলা সব নিজগ্রাম॥
গ্রামান্তর হ'তে দেখিতে আইলা যতজন।
তার দর্শন-কৃপায় হয় তাহারি সম॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করায়।
অন্য গ্রামে আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই অন্য গ্রাম করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈলা সব দক্ষিণ দেশ॥
এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে!
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হইল প্রভুর সম্বন্ধে॥

এইরূপে পথে অচিন্ত্যনীয় পরমাদ্ভুত অলৌকিক ঐশীশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রভু দেহচেষ্টাদিবিরহিত হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথন তিনি কূর্ম্ম-তীর্থে উপনীত হইলেন, তখন বাসুদেব নামে একজন মহাব্যাধিগ্রস্থ ভক্তিমান ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন; দয়াল ঠাকুর তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সেই পূতিগন্ধময় কীটসঙ্কুল ক্ষতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন, ব্রাহ্মণও দেবদুর্লভ শ্রীঅঙ্গের স্পর্শসুখ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করিয়া প্রভুর চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"বহুস্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥"

এইরূপে আচারে পতিত, অধম, দুর্জ্জন, কাঙ্গাল সকলকে সমভাবে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া প্রভু জিয়ড় নৃসিংহদেব-বিগ্রহ দর্শন করিয়া ক্ষীণ-সলিলা গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলেন। পরে গোদাবরী পার হইয়া রাজমাহেন্দ্রীনগরে গমন করিলেন এবং তথায় স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক ঘাট ছাড়িয়া কিঞ্চিৎদূরে জলসন্নিধানে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামানন্দ-মিলন।

এই সময়ে মহা সমারোহে বাদ্যোদ্যম সমভিব্যাহারে ও বহু বৈদিক ব্রাহ্মণবেষ্টিত হইয়া দোলারোহণে রায় রামানন্দ গোদাবরী স্নানে আগমন করিলেন।

"প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রাম রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥"

রসিক রামানন্দকে দেখিয়া রসিকশেখর প্রভুর মন তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এদিকে রামানন্দের

হৃদয়েও, দূরে শত সূর্য্যসমদীপ্তিশালী সুবর্ণ বর্ণ অপূর্ব্বকান্তিবিশিষ্ট সন্ন্যাসীটীকে দর্শন করিয়া স্বতঃই তাঁহার সহিত মিলিত হইতে বলবতী বাসনা উপস্থিত হইল; কেননা তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার স্বতঃই মনে হইতে লাগিল, এ বস্তুটী এ মর্ত্ত্যভূমির নয়। তাই রামানন্দ ব্যাকুল হইয়া আস্তে ব্যস্তে প্রভুর নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমিই রায় রামানন্দ? আমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট তোমার নিষ্ঠা ও পবিত্র প্রেমের ব্যাখ্যা শুনিয়া তোমাকে দর্শন করিতেই এই স্থানে আসিয়াছি," এই বলিয়া তিনি ভাগ্যবান রামানন্দকে দুই দীর্ঘ ভুজ দিয়া বুকের মধ্যে ধারণ করিলেন। দীনস্বভাব প্রেমিক রাজা রামানন্দ তখন প্রভুকে বহু কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, যথা—

"রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হইল মোর মনুষ্য জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজ-সেবক বিষয়ী শূদ্রাধম॥"

এইরূপে রামানন্দ প্রভুর বহু স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন ও তাঁহাকে দিনকয়েক তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কৃপাময় প্রভুও এই বাঞ্ছিত-মিলনে হৃষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবস তথায় থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর রামানন্দের আশ্রিত জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণের আলয়ে ভিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি নামগান করিতে লাগিলেন, পরে সন্ধ্যা

সমাগত হইলে রাজা রামানন্দ একমাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, তখন উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপ-কথন আরম্ভ হইল।

সাধ্যসাধন-তত্ত্ব।

প্রভু কহিলেন "ওহে রায় তোমার মুখে কিছু সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আমি জানিতে ইচ্ছা করি, জগতে সাধ্য বস্তু কি? রামানন্দ কহিলেন—স্বধর্ম্ম-পালনপূর্ব্বক, অর্থাৎ ঋষি-নির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাজনা দ্বারা বিষ্ণু আরাধনা করাই পুরুষের কর্ত্তব্য।

প্রভু।—এ বাহিরের কথা, গূঢ় কথা বল।

রামানন্দ।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বকর্ম্ম ও তাহার ফলার্পণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

প্রভু।—এহো বাহ্য আগে কহ আর।

রামা।—তবে স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে নিরূপিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ভক্তি সাধন করাই শ্রেয়ঃ।

প্রভু।—এহো বাহ্য আগে কহ আর।

রামা।—জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যাঁহার সুখদুঃখ, সম্পদ বিপদ সমজ্ঞান হইয়াছে এবং যিনি শোক ও মায়াতীত, যিনি আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাব-যুক্ত হইয়া ভক্তি সাধনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু।—এহো বাহ্য আগে কহ আর।

রামা।—জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞান-চালিত না হইয়া সাধুজনপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ভক্তিমার্গের পথিক হওয়াই সর্ব্বসাধ্যসার।

প্রভু বলিলেন "এই হয় অর্থাৎ এ উত্তম কথা, কিন্তু ইহার অপেক্ষা আরও উত্তম যাহা জান বল।"

রামানন্দ।—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।

প্রভু।—এই হয় আগে কহ আর।

তখন পরম জ্ঞানী ও পরম প্রেমিক রামানন্দ একে একে প্রেমের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ও কান্তরসের অবতারণা করিলেন। প্রভুও সকল মত সানন্দে গ্রহণ করিয়া, যদি ইহাপেক্ষা আরও উক্ত ভাব থাকে, তাহাই কহিতে রামানন্দকে আদেশ করিলেন। রামানন্দও পুলকানন্দে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, ব্রজগোপীদের যে প্রেম, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার। তখন—

" প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রতে বাখানি॥ চৈঃ চঃ।

এই শ্রীরাধার প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ও রাধা এবং তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম কি বস্তু, তাহাই বুঝাইতে রামানন্দ বহু শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন। তখন রসিকশেখর প্রভু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কহিলেন, যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—

"প্রভু কহে এই হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধি গতি নাহিক আমার॥"

তবে যদি তুমি অনুমতি কর, আমার স্বরচিত একটী গীত আছে, তাহাই গান করি, এই বলিয়া রায় গাহিলেন—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মনে মনোভাব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহইতে কিছু বল জানি॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন।
দুঁহুর মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অবশেষে বিরাগ তুঁহু ভৈল দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় পতি গান॥"

সুকণ্ঠ ভাবুক রামানন্দ প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে ভক্তিতে বিভোর হইয়া গাহিতেছেন, আর প্রেমিক চূড়ামণি প্রভু শুনিতে শুনিতে প্রেমাপ্লুত হইয়া ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার ভাব সাগরে এত লহরীর সৃষ্টি হইয়াছে যে, ভাবাতিশয্যে অস্থির হইয়া তিনি স্বহস্তে রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন।

এইরূপে লীলাময় প্রভু রামানন্দের শরীরে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহার মুখে নিজ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। রামানন্দের মধুর সংসর্গে দশ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া এবং পরিশেষে রামানন্দকে আপনার ভুবনানন্দ মঙ্গলময়রূপ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু যে পথে চলিতে লাগিলেন, তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে অমনি অনম্ভুভবনীয় ভাবে প্রেমের ঝটিকা বহিতে লাগিল। যে কেহ তাঁহার দর্শনলাভ

করিলেন, তিনিই প্রেমে মত্ত হইলেন ; আবার তাঁহাকে যিনি দর্শন বা স্পর্শ করিলেন, তাঁহারও ঐরূপ অবস্থা হইল। এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অল্পকালের মধ্যেই হরিনাম প্রচারিত হইল। রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া প্রভু মল্লিকারজুনীতীর্থ, অহোবল, সিদ্ধিবট, স্কন্ধক্ষেত্র, ত্রিমট, বৃদ্ধকাশী, ত্রিপদিমল্ল, বেঙ্কটার, ত্রিপদি, পানানর সিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিমল্ল প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থানে রামানুজ ও রামায়িৎ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ সাদরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিল। একস্থানে কতকগুলি বৌদ্ধমতালম্বী লোক ছিলেন, তাঁহাদের গুরু প্রভুর সহিত বিচারে পরাস্ত হইলে, তাহারা অসূয়া-পরবশ হইয়া এক থালি অশুদ্ধান্ন প্রসাদ বলিয়া তাঁহাকে অর্পণ করে। অশুদ্ধ হইলেও প্রসাদ বলিয়া অর্পিত সেই অন্ন লইয়া প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে আকাশ হইতে এক বৃহৎ পক্ষী আসিয়া সেই অন্নপাত্র তুলিয়া লইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল, তাহা বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকে পতিত হইল, তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছান্তে প্রভুর এই অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সশিষ্য তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপ বহুস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু কাবেরী-তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় অবগাহন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ; এখানে বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন ভক্তের গৃহে রহিয়া তিনি চতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন করেন। অনন্তর ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কামকোষ্টি, দক্ষিণ মথুরা, মহেন্দ্র শৈল, সেতুবন্ধ, ফল্গুতীর্থ, পঞ্চাপম্বরা দ্বৈপায়নী, কোলাপুর, পাণ্ডুতীর্থ, মলয় পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মল্লার দেশে উপস্থিত হন। এখানে ভট্টমারি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি শ্রীপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে বহুরূপে প্রলোভিত করে। প্রভু

তাহাদের মায়া হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। ক্রমে মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে নর্ম্মদা-তীরে বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হন; এখানে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার প্রমুখাৎ জানিতে পারেন যে, তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সেইখানেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এইখান হইতে উভয়ে মিলিয়া দ্বারকা তীর্থে গমন করেন; পরে প্রভু একাকী পম্পা সরোবর, তাপ্তি নদী, ঋষ্যমুখ, দণ্ডকারণ্য হইয়া পঞ্চবটীতে উপনীত হন, তথা হইতে নাসিক, ত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া রামানন্দের সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়েন, তথায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া তিনি পূর্ব্বপথে আলালনাথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এই আলালনাথ হইতে তিনি সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রমুখ ভক্তমণ্ডলী তাঁহার প্রত্যাগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া মহাহ্লাদে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সহিত কীর্ত্তনরঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শত শত যোজন পথ, অরণ্য, প্রান্তর, গিরি, নদী, অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে শৈব, রামাইৎ, বৌদ্ধ, এমন কি মুসলমান পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ও ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে হরি-প্রেমে উন্মত্ত করিয়া এক বৎসর আটমাস ষড়্‌বিংশতি দিন পরে মাঘ মাসে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন।

নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন।

মহাপ্রভু জগৎ উদ্ধার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে—

"কাশী মিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তারে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥"

এই কাশীমিশ্রের ভবনেই শ্রীপ্রভু, যতদিন নীলাচলে ছিলেন, ততদিন বাস করিয়াছিলেন। এই ভাগ্যবান মিশ্রের শ্রীমন্দিরে অদ্যাপি প্রভুর পার্থিব নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার শ্রীপদের কাষ্ঠ-পাদুকা, শ্রীঅঙ্গের জীর্ণাতিজীর্ণ কন্থা, যাহা এক্ষণে কিঞ্চিৎ তুলামাত্র অবশিষ্ট আছেন এবং একটী কাষ্ঠ কমণ্ডলু ও কাষ্ঠ করঙ্ক সুরক্ষিতভাবে বর্ত্তমান আছেন। পুরীযাত্রী ভক্তগণ ইচ্ছা ও অনুসন্ধান করিলে এখনও সেগুলি দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

মিশ্রভবনে রহিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের সভক্তি পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এখানেই চৈতন্যলীলার অর্দ্ধপাত্র শিখি মাইতী, রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও তাহার আর চারি পুত্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র এবং দুই পূর্ণপাত্রস্বরূপ দামোদর ও রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হয়।

এই সময়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রভুর দক্ষিণভ্রমণসঙ্গী কৃষ্ণদাস বিপ্রকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি গৌড়ে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই নবদ্বীপে শোকাকুলা শচীদেবী ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কুশলবার্ত্তাদি প্রদান করিয়া এবং

তাহাদিগকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-প্রকাশে গমন করিলেন। শ্রীপাদ্ অদ্বৈত প্রভু, কৃষ্ণদাসের মুখে মহাপ্রভুর কুশলবার্ত্তা পাইয়া মহাহ্লাদে মহোৎসবে রত হইলেন। পরে সমবেত ভক্তগণের ঐকান্তিক ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আদেশ লইয়া, বহু স্ত্রী, পুরুষ, ভক্ত-সমভিব্যাহারে রথ-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য স্মরণ পূর্ব্বক নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মহানন্দে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলের সন্নিধানে উপনীত হইলেই শ্রীধামে তাঁহাদের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইল, অমনি নীলাচলের ভক্তবৃন্দ ঊর্দ্ধশ্বাসে গৌরের ভক্তগণকে দেখিতে চলিলেন; দেখিতে দেখিতে সমস্ত নীলাচলে এক মহারোল উপস্থিত হইল, আর কাতারে কাতারে বাল, বৃদ্ধ, যুবা, ভক্ত, অভক্ত, স্ত্রীপুরুষ সকলে এই অপূর্ব্ব ভক্ত, মিলন, দেখিতে চলিলেন। অন্যের কথা কি! স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া এই প্রেমের মিলন দেখিতে প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন। এদিকে গৌরের ভক্তগণ পুরী প্রবেশ করিলে, মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর এবং গোবিন্দ দ্বারা প্রসাদী মালা ও চন্দন প্রেরণ করিয়া ভক্তগণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রভুপ্রেরিত মালাচন্দনে বিভূষিত হইয়া হরিনামরত অদ্বৈতাদি দুইশত ভক্ত যখন প্রেমানন্দে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু মিলনে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের অলৌকিক বৈষ্ণবশ্রী ও রূপের ছটা সকলকে মুগ্ধ করিল। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

> "রাজা কহে দেখি মোর হৈল চমৎকার।
> বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর॥
> কোটী সূর্য্যসম সব উজ্জ্বল বরণ।
> কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন॥

ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥"

ভক্তমিলন।

এইরূপ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া গৌরের ভক্তগণ জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রে প্রভু-দর্শনে গমন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুসন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে একে একে পরিচিত অপরিচিত সকলকেই হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এইরূপে সকলকেই সম্ভাষণ করিলে পর, মুরারীগুপ্ত ও হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদের অন্বেষণ করিলেন। এতক্ষণ প্রেমানন্দে কেহ তাঁহাদের উদ্দেশ লয়েন নাই। তাঁহারা দুটীতে নিজেদের অতি দীন হীন নীচ মনে করিয়া পুরী প্রবেশ করেন নাই। এক্ষণে প্রভুর আদেশে দীনাতিদীন মুরারী দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে গ্রহণ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাস নিজেকে অত্যন্ত অধম কুলোদ্ভব মনে করিয়া কোন মতেই শ্রীমন্দিরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন না। তখন দয়াল ঠাকুর স্বয়ং হরিদাস-মিলনে আগমন করিলেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেম নাম সংকীর্ত্তনে॥
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা।
প্রেম আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া॥

দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্য-গুণে॥"

ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু দয়াল প্রভু হরিদাসের বাসনা পূর্ণ করিয়া দূরে কাশীমিশ্রের পুষ্পোদ্যানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই হরিদাসই তাঁহার নীলাচল-বাসের একজন প্রধান সঙ্গী। কাশী-মিশ্রের উদ্যানে যে বকুল বৃক্ষতলে বসিয়া হরিদাস নাম লইতেন, সে বৃক্ষটী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ও সিদ্ধবকুল নামে খ্যাত, এই বৃক্ষটী সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, কথিত আছে, কোন সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথনির্ম্মাণের নিমিত্ত এই বৃক্ষটী কর্ত্তন করিতে উৎকলাধিপতি আদেশ দেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কোনও মতে এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের শরণাপন্ন হয়েন, তখন ভক্তবৎসল প্রভু ভক্ত-গণকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করেন। পরদিন রাজাজ্ঞায় রাজকর্ম্মচারীরা গাছ কাটিতে আসিয়া দেখিলেন যে তেজশালী বিশালকায় বৃক্ষ যেন কোন ঐশী শক্তিতে অলৌকিকভাবে বাঁকিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এবং এক রাত্রিতে সমস্ত বৃক্ষের সার শূন্য হইয়া বল্কলমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং সে বৃক্ষ আর কাটা হইল না, উহা অদ্যাপি সেই ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

নীলাচলে প্রাণাধিক প্রিয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রথযাত্রার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দিন প্রভু প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তবৃন্দসঙ্গে রথযাত্রাদর্শনে গমন করিলেন। সেই সুসজ্জিত পতাকাদিশোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথবিরাজিত অপূর্ব্ব রথশ্রীদর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং আপনার ভক্তগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া প্রতি সম্প্রদায়ে দুইখানি করিয়া মাদল এবং একজন করিয়া মূল গায়ক নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

"সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল।
যার ধ্বনি শুনি হইল বৈষ্ণব পাগল॥"

এইরূপে সাতটী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইলে প্রভু এক অপূর্ব্বলীলা প্রকাশ করিলেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যান আমারে দয়ায়॥"

এইরূপে এক প্রভু এক সময়ে সাত ঠাঞি প্রকাশ পাইয়া সকলের মনেই আনন্দোৎপাদন করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া যখন ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন ভক্তাবতার শ্রীপ্রভু ভক্তিতে বিভোর হইয়া প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কর-যোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন—

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌঃ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দ॥"

এইরূপে স্তব করিতে করিতে প্রভু রথের সম্মুখে গমন করিতেছেন, আর ভাবাবেশে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার পদস্খলিত হইয়া পড়িতেছে। ক্রমে রথ যখন বলগণ্ডী সমীপে আসিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িল, তখন প্রভুও ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্তৃক ব্যবহৃত পুঁথী, কমণ্ডলু ও কাঁথা।

কাশীমিশ্রের বাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নীলাচলস্থ বাস-ভবন নির্দিষ্ট ছিল। এই বাটীটী এক্ষণে রাধাকান্তের মঠ বা শ্রীগৌরাঙ্গ গম্ভীরা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ইহারই একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বাস করিতেন। ঐ গৃহটী এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে ও উহারই অভ্যন্তরে শ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত পুঁথী, কমণ্ডলু, কন্থা ও কাষ্ঠপাদুকা সংরক্ষিত ও সংপূজিত হইয়া থাকে। কাঁথাখানি জীর্ণ হওয়ায় উহা একটী কাচের বাক্সে সংরক্ষিত হইয়াছে। ছবিতে কমণ্ডলুর বামদিকে ঐ বাক্সটীর প্রতিকৃতি উঠিয়াছে।

প্রতাপরুদ্র মিলন।

এই সময়ে উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র, যিনি এতাবৎ বহু চেষ্টাতেও প্রভুর কৃপাপাত্র হয়েন নাই, দীন বৈষ্ণববেশে তথায় গমন করিয়া বাহ্যজ্ঞানবিরহিত প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে স্থান কালোচিত এক শ্লোক পাঠ করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটী, ভাগবৎ শ্রবণে বাহ্যজ্ঞান পাইয়া ও উল্লাসিত হইয়া রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতে—

"প্রভু বলে কে তুমি করিলা মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কারো না কহিবে এই নিষেধ করিল॥"

এইরূপে মহোৎসবে রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ কার্ত্তিক মাসের উত্থান দ্বাদশী পর্য্যন্ত মহানন্দে নীলাচলে বাস করিলেন। পরে—

"একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লইয়া।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥"

এইরূপে দুই ভাই নিভৃতে মিলিয়া যুক্তি করিয়া পরে গৌড়ীয় ভক্তগণকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত আদেশ পাইয়া ভক্তগণ মহা শোকান্বিত হইলেন; কিন্তু প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী না হইয়া সকলে সেই উদ্যোগ

করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাময় প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস আদি প্রধান প্রধান ভক্তগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কয়টী আদেশ করিলেন ; যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

আচণ্ডালে প্রেমদান।

"আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে করিও কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশ।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশ॥
রাম দাস গঙ্গাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীরাম পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিবে॥"

এইরূপে জনে জনে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া প্রভু শ্রীবাসের হস্তে প্রসাদ ও প্রসাদী বস্ত্রাদি দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয় শ্রীবাস! মাকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইও, আর এই মহাপ্রসাদ ও প্রসাদী বস্ত্রাদি দিয়া আমার হইয়া মিনতি করিয়া বলিও, যেন আমার সন্ন্যাসীরূপ নির্ম্মল কার্য্যকে তিনি ক্ষমা করেন, আর আমি যে গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবারূপ মহাভাগ্য ও মহাতপস্যা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি,

যেন আমার সে দারুণ অপরাধও ক্ষমা করেন। আমি তাঁহার অবোধ সন্তান, সুতরাং তাঁহার ক্ষমার যোগ্য। আর শ্রীবাস আর একটী কথা বলিয়া দেই—আমার দেবীমাতাকে বলিও যে, সূক্ষ্মভাবে আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আছি। আমি নিত্যই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে নবদ্বীপে যাইয়া থাকি, এবং তিনিও আমাকে দেখিতে পান; কিন্তু ভাবাবেশে উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না।” অনন্তর তাঁহাদের সকলকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন, কেবল গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি দশজন প্রভুর নিকটে রহিলেন।

হরিদাসকে দণ্ড।

পরচর্চ্চা, পরহিংসা, পরস্ত্রী সম্ভাষণ প্রভৃতি শ্রীপ্রভুর পার্ষদগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এই নীলাচল বাস-কালে গৌড়ীয় ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার পার্ষদরূপে তাঁহার সেবায় রত ছিলেন, তাহার মধ্যে নবদ্বীপ-নিবাসী ছোট হরিদাস একজন প্রধান। বর্ত্তমান কালে যে খোল যন্ত্র আমরা শ্রীহরি সংকীর্ত্তনে ব্যবহার করি, উহা তাঁহারই আবিষ্কৃত; তিনি এক দিকে যেমন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তেমনি অপর দিকে সম্পন্ন একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব বলিয়াও খ্যাত হইয়াছিলেন। একদিন এই হরিদাস শতানন্দ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান আচার্য্য কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুণ্যশ্লোক শিখীমাইতীর পুণ্যশীলা বৃদ্ধা ভগ্নী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা আনয়ন করায় প্রভু কঠোর হৃদয়ে তাঁহার দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। শত অনুরোধ শত চেষ্টাতে প্রভুর সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হয় নাই, যখন পরমানন্দপুরীপ্রমুখ শ্রেষ্ঠাধিকারী ভক্তগণ

আসিয়া প্রভুকে হরিদাসের দণ্ড ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন হরিদাসের সহস্র গুণ ভুলিয়া প্রভু বলিলেন :-

"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব সর্ব্ব বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া হরিদাস তিন দিন নিরম্ব উপবাসী থাকিলেন, পরে একবৎসর কাল নাম মাত্র আহার করিয়া প্রভুর প্রসন্নতা লাভার্থে কতমতে চেষ্টা করিয়াও যখন সকলকাম হইলেন না, তখন একদিন

রাত্রি শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াচয়তে গেল কারে কিছু না বলিয়া॥
প্রভুপদ প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি পরাণ ছাড়িল॥

শ্রীপ্রভু যখন হরিদাসের কঠোর পরীক্ষার কথা শ্রবণ করিলেন, তখন বলিলেন!

"প্রকৃতি দর্শন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত।" প্রভুর নিয়ম পালনে এই এই দার্ঢ্য দেখিয়া—

"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে॥"

কিছু দিন পরে শ্রীপ্রভু বৃন্দাবন যাইতে মানস করিয়া উহা ভক্তজন-সকাশে ব্যক্ত করিলে, রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কোন মতেই প্রভুকে তৎকালে নীলাচল পরিত্যাগ করিতে

দিলেন না; সুতরাং ভক্তগণের ঠাকুরটীর আর তখন বৃন্দাবন-দর্শনে গমন করা হইল না। এইরূপে এক দুই দিন করিয়া তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণও প্রতি বৎসর প্রভু-দর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় বৎসরে প্রভু যখন ভক্তগণ-কে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ করিলেন—

"প্রতি বর্ষে নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সকল করিবা॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ।
কায়া প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এই মতে বিদায় দিল সর্ব্ব ভক্তগণ॥"

গৌড়-যাত্রা।

মহাপ্রভু এইরূপে আরও দুই বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণের সম্মতিক্রমে গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন, এইরূপ স্থির করিয়া বিজয়া দশমীর দিবস প্রভাতে প্রভু নীলা-চলচন্দ্রের ইন্দুবদন দর্শন করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। পরে কটকে আসিয়া সপরিবার প্রতাপরুদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু নীলাচল ত্যাগ

করিলেন। এই সময়ে গঙ্গাধরাদি জনকয়েক অবোধ ভক্ত কিছুতেই প্রবোধ না মানিয়া প্রভুর সঙ্গে যাইতে একান্ত জিদ্ করিলেন। মহাপ্রভু কিছুতেই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে না পারিয়া প্রিয়তম গঙ্গাধরকে বলিলেন—

"মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িল।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পণ্ডিত পড়িল॥"

মহাপ্রভু নৌকাযোগে চিত্রোৎপলী নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপরুদ্রের নির্দ্দেশক্রমে এবং ইচ্ছায় রামানন্দ, হরিচন্দন প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীগণ উৎকল-সীমার পথে প্রভুর কোনও কষ্ট না হয়, সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু রেমুনায় উপস্থিত হইয়া ইচ্ছাময় প্রভু তাঁহাদিগকে কোনও মতেই আর সঙ্গে লইলেন না, প্রভু তখন রামানন্দ-দিকে সান্ত্বনা দান করিয়া বিদায় দিলেন। যথা—

"এই মত বলি প্রভু রেমুনা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িল রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওঢ্রদেশ সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ অধিকারী প্রভুর মিলিলা॥"

এইরূপে হিন্দু অধিকারের সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে প্রভু দেখিলেন যে, যবনাধিকারে হিন্দুমাত্রের প্রবেশ দুর্লভ; তাই তিনি রূপ-

নারায়ণ-তীরবর্ত্তী পিছলা গ্রামে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। এখানে প্রভুর অচিন্তনীয় শক্তির গুণে সেই কঠিন হৃদয় যবনসেনাপতি ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ প্রভুর অলৌকিক রূপগুণ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। দয়াল প্রভু নির্ব্বিবাদে এই সকল যবনকে উদ্ধার করিয়া গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং শীঘ্রই শ্রীপাট খড়দহের নিকটবর্ত্তী পানিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এই রাঘব প্রভুর একজন অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। এখান হইতে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের কুমারহট্টস্থ নূতন ভবনে উপস্থিত হইলেন। কুমারহট্ট অর্থাৎ বর্ত্তমান হালিসহর গ্রাম শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান; তাই এখানে আসিয়া প্রভু তুলভজ্ঞানে কুমারহট্টের ধূলিরেণু উত্তরীয়-অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন।

লোকানুরাগ।

ভক্তপ্রধান ভাগ্যবান শ্রীবাসকে কৃতার্থ করিয়া ভক্তগতপ্রাণ প্রভু কাঞ্চনপল্লীর (কাচড়াপাড়া) শিবানন্দের ভবনে গমন করিলেন। তৎপরে উক্ত গ্রামবাসী বাসুদেবের বাটী গমন করিলেন। এই যে প্রভু নীলাচল হইতে শত শত ক্রোশ অতিবাহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সে একাকী আসিতেছেন না; যে অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি হরিনামপ্লাবিত করিয়াছিলেন, এই সমগ্র পথেও সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া চলিতেছেন; আর তাঁহার সঙ্গে শত শত, সহস্র সহস্র লোক এক মহা আকর্ষণের বলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। এই অপূর্ব্ব লোক-সংঘর্ষের বিষয় কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

"গঙ্গাতীর-সীমা প্রভু যেই মাত্র গেলা।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈলা॥
যত লোক আইল তথা কহিতে না পারি।
এই কথা শুন মনে বুঝিতে বিচারি॥
ধরণীতে ধূলি রাশি যতেক আছিল।
হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল॥
অথবা আকাশে ছিল যত তারাগণ।
নর হইয়া পৃথিবীতে করিলা গমন॥

এইরূপে অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, আর যেমন তিনি অগ্রসর হইতেছেন, অমনি সেই স্থানের ধূলি গ্রহণ করিতে শত শত লোক এককালে পড়িতেছে। এইরূপে ক্রমে সেই স্থান গর্ত্তময় হইয়া যাইতেছে। যথা—

"চরণ অর্পেণ যে স্থানে
সে স্থানের ধূলি নিতে লোক যায় শতে শতে
পথে গর্ত্ত হয় ক্রমে ক্রমে॥"

শ্রীপ্রভু কাঞ্চনপল্লী ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, আর অমনি অসংখ্য লোক কূলে কূলে প্রভুর অনুসরণ করিল। যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে

নৌকাপথে চলিলা গৌরহরি।
দুকূলে অসংখ্য লোক চলে হরি বলি॥
প্রভুর চরণ-জল লইবার তরে।
সহস্র সহস্র লোক জলে আসি পড়ে॥
আকণ্ঠ হইল জল তবু ব্যগ্র হঞা।
পাদোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া॥

লোকের ব্যগ্রতা দেখি করুণা জন্মিল।
প্রভু-ইচ্ছায় পাদোদক সর্ব্বলোকে পাইল॥

এইরূপ অসংখ্য ভক্ত-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে শুভাগমন করিলেন। বহুদিন পরে চিরবাঞ্ছিত হারাণ নিধিকে পাইয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণের যে মহানন্দ জন্মিল, তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা নাই।

জন্মভূমি-দর্শন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপচন্দ্র, শচীদুলাল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ, নদীয়ার সর্ব্বস্ব প্রভু নবদ্বীপের এক অংশ বিদ্যানগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আর কিছুদিন এই চিরপ্রিয় ভূমিতে শান্তিতে থাকিবার মানসে গোপনে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাচস্পতি গৃহদ্বারে বৈকুণ্ঠনাথকে অতিথি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে দিশেহারা হইলেন, আর পুলকপূর্ণিত-অঙ্গে গোপনে প্রভুর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন, কিন্তু প্রভুর এ গোপনভাব অধিক স্থায়ী হইল না। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সব লোক শুনিলেক প্রভুর বিজয়॥
নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলেন গৌরমণি॥
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
স্বশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥

প্রভুর নবদ্বীপ-আগমনবার্ত্তা যখন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন

দলে দলে লোকসকল আসিয়া বাচস্পতির গৃহ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতে লাগিল. যখন আর প্রাঙ্গণে স্থান হইল না, তখন সকলে নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও মাঠে সমবেত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও যখন স্থান সঙ্কুলান হইল না, তখন লোকে অপথ, বন, জঙ্গল, বৃক্ষশাখা প্রভৃতি পূর্ণ করিতে লাগিল। যথা ভাগবতে—

পথ নাহি পায় লোক লোকের গহনে।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক যায় সেই পানে॥
লোকের গমনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেক সকল দিব্য পথময় হইল।

অপরাধ-ভঞ্জন।

এইরূপে বিদ্যানগরে যখন মহাজনতা হইল, তখন লীলাময় প্রভু বাচস্পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পরপারস্থ কুলিয়াগ্রামে মাধব দাসের বাটী যাইয়া উপনীত হইলেন। এই কুলিয়াতেই পরম ভাগবত দেবানন্দ ঠাকুর বাস করিতেন। তিনি পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিহীন ব্যাখ্যা করিতেন। প্রভু যখন নবদ্বীপে থাকিতেন, তিনি তখন দেবানন্দকে এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মোহান্ধ প্রভুকে তখন চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কথা অবহেলা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্তশিরোমণি বক্রেশ্বরের কৃপায় দেবানন্দ নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। দয়াময় প্রভুও তাঁহার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে আপনার সুশীতল বক্ষে গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইয়াছেন, সুতরাং আপনার সুখাপেক্ষা পরের সুখের প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি সমধিক, সেজন্য প্রভুর এই কথায় সাহস পাইয়া বর

চাহিলেন যে, যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিয়া অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, যেন অবিচারে তাহার অপরাধ ভঞ্জন করেন। প্রভুও তাহাতে সম্মত হইয়া ঐ বর প্রদান করেন। তদবধি কুলিয়া অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, কেননা এই শ্রীপাটের নিদর্শন এখন নবদ্বীপের সন্নিকটে কোথাও পাওয়া যায় না—বুঝি দেবী গঙ্গা এই লোভনময় পবিত্র তীর্থের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া আপনার পবিত্র বক্ষে ইহাকে রক্ষা করিতেছেন।

শেষ বিদায়।

এই কুলিয়াগ্রামেই শ্রীপ্রভু আত্মজনের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন এবং ত্রিলোকপূজ্য স্বামীর স্নেহের শেষ নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার শ্রীপদের কাষ্ঠ পাদুকা দুইখানি প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপ্রভুর আদেশক্রমে তাঁহার শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপনা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-স্থাপিত এই বিগ্রহমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্ধানের পর তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ঐ বিগ্রহ সেবার অধিকারী হয়েন। মাধবাচার্য্য সম্পর্কে মহাপ্রভুর শ্যালক, তাঁহার বংশীয়েরা নবদ্বীপে শ্যালকগোস্বামী নামে পরিচিত এবং বংশানুক্রমে ঐ মূর্ত্তির সেবা করিয়া আসিতেছেন।

বাদসাহের সম্মান।

কুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার ধারে ধারে রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই রামকেলী গ্রাম তদানীন্তন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের এক

অংশ বিশেষ। পাঠানবংশীয় সৈয়দ হুসেন সাহা তখন এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইলে সেখানে এতলোক সংঘর্ষ হইয়াছিল যে, রাজা ও রাজসেনাপতি পর্য্যন্ত প্রথমে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে তাঁহারা যখন অবগত হইলেন যে, একজন সন্ন্যাসী এ স্থানে শুভাগমন করায় তাঁহারই দর্শনের জন্য এই ভয়ঙ্কর জনতা হইয়াছে, তখন হুসেন সাহ বলিলেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

"রাজা বলে বসু ইহো সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
লোকের সমূহ দেখি মোর লাগে ডর॥
আমি মহারাজ যদি মহাযত্ন করে।
দুই চারি লক্ষ লোক যুড়িতে না পারে॥
ঘর দ্বার ছাড়ি লোক আনন্দিত হইয়া।
বিনিদানে স্ত্রী পুরুষ চলে লাগ লইয়া॥
অতএব মনুষ্য না হয় এই জন।
ইহারে না কহ কিছু কাজি বাথান॥

এইরূপে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

রূপসনাতন-মিলন।

এই হুসেনসাহার রাজকীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে দুই ভ্রাতা দবির খাস ও সাকার মল্লিক পদে অভিষিক্ত ছিলেন, এবং রাজসংসারে তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। হুসেনসাঃ বাদসাহ হইলেও কার্য্যতঃ এই দুই ভাই তখন রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা সতত মুসলমান-সহবাসে যাবনীয়ভাব প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ বিলক্ষণ ভক্তিমান ছিলেন। ইঁহারা আদৌ ভরদ্বাজগোত্রজ যজুর্ব্বেদীয়

ব্রাহ্মণ। ইহাঁদের পূর্ব্ব নিবাস কর্ণাট নগরে। ইহাদের পিতার নাম শ্রীকুমার। এই শ্রীকুমারের তিন পুত্র। প্রথম সনাতন, যিনি দবির খাস নামে খ্যাত। দ্বিতীয় শ্রীরূপ বা সাকর মল্লিক; তৃতীয় শ্রীরাম-ভক্ত শ্রীবল্লভ। এই সনাতন ও রূপ আপনাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভাবে বাদসাহের উজীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীপ্রভুর গুণকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই অমূল্য নিধি নিকটে পাইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়া একদিন গভীর নিশীথে দীনবেশে দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। দয়ালঠাকুর শ্রীপ্রভুও তাঁহাদের আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই দুই প্রেমিক ঠাকুর কিছুদিন পরে একে একে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং প্রভুর নিদেশানুযায়ী তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেই লুপ্ত প্রায় মহাতীর্থের পুনঃ প্রকাশ সাধন করেন এবং বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও বৈষ্ণতত্ত্ব লোকহিতার্থে প্রকাশ করেন।

নীলাচলে প্রত্যাগমন।

শ্রীপ্রভু এইরূপ রূপসনাতনকে উদ্ধার করিয়া যখন মথুরা-উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, তখন সনাতন করযোড়ে নিবেদন করিলেন, যথা—

"সনাতন কহে প্রভু করি নিবেদন।
ছেন পরিচ্ছদে না যাইবে বৃন্দাবন॥
দুই এক সঙ্গে লঞা মথুরা যাইবে।
তবে এই দরশনে মহা সুখ পাইবে॥"

প্রভুও একথা গ্রহণ করিয়া সেযাত্রা মথুরা যাইবেন না, সিদ্ধান্ত করিয়া

গৌড় হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিয়া এবং শচীমাতা প্রভৃতির মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা।

এখানে বর্ষা চারিমাস অতিবাহিত করিয়া শ্রীপ্রভু একদা বলভদ্র ভট্টচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি-শেষে গোপনে বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন।

"প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণে করে ফিরে ব্যাকুল হইয়া॥
স্বরূপ গোসাঞি সবায় কৈল নিবেদন।
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিল।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিল॥"

এইরূপে ইচ্ছাময় প্রভু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার মানসে বিপথে শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যে মারিখণ্ডের বিজন-বন এখনও দুর্গম, এই বনপথে প্রভু চলিয়াছেন, আর যত বনবাসী হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি প্রভুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

"নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥"

সঙ্গী ব্রাহ্মণ সচকিতে প্রভুর অনুগমন করিতেছেন, আর বিস্মিত হইয়া প্রভুর কত অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যথা ব্যাঘ্র দেখিয়া—

"প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥"

কাশী-প্রবেশ।

এইরূপে পশু পক্ষী প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া শ্রীপ্রভু অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন, এবং তথায় পূর্ব্বপরিচিত ভক্ত তপন মিশ্রের ভবনে কয়েকদিবস অতিবাহিত করিয়া প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। লীলাময় প্রভু কাশী হইতে গমন করিলে তদানীন্তন কাশীর জগৎগুরু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দণ্ডী সন্ন্যাসীর রাজা দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের ন্যায় মহামান্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, অদ্বিতীয় বাজীকর শ্রীচৈতন্য যদিও সার্ব্বভৌমের ন্যায় মহাপণ্ডিতকেও মন্ত্রবলে মুগ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে তাঁহার ভাবুকালি বিকাইবে না দেখিয়া মানে মানে কাশী ত্যাগ করিলেন। শ্রীপ্রভু লোকমুখে এ কথা শুনিলেন এবং বলিলেন, "আমি দুর্ব্বহ বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি না বিকায়, তাহা হইলে যৎকিঞ্চিৎ লইয়া ছাড়িয়া দিব, অথবা একেবারে বিলাইয়া যাইব।

যাহা হউক, প্রভু সে যাত্রা প্রকাশানন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া মথুরা-অভিমুখে ছুটিলেন এবং শীঘ্রই প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই যে বৃন্দাবন-দর্শনে প্রভু চলিয়াছেন, পথে যাহাকে পাইতেছেন, তাহাকেই অকাতরে প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ করিলেন, যথা—

"মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকের নাচায়॥"

এইরূপে প্রেম বিলাইয়াও স্বয়ং ভাবাতিশয্যে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া প্রভু টলিতে টলিতে বৃন্দাবন-উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন ; এক্ষণে সম্মুখে চির-অভিলষিত চিরাকাঙ্ক্ষিত শ্রীযমুনা দর্শনে প্রভু প্রেমবিহ্বল হইয়া যমুনায় ঝম্পপ্রদান করিলেন। এইরূপ যেখানে যেখানে যমুনা-দর্শন পাইলেন, সেইখানেই মহাকুতূহলে জল-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

"পথে যাহাঁ যাহাঁ হয় যমুনা দর্শন।
তাহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥"

এই প্রেমে অচেতন হইয়া প্রভু মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রেমানন্দে—

"বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরিধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধ্বনি ॥"

শ্রীবৃন্দাবন-প্রবেশ।

প্রভু মথুরা হইতে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। যে বৃন্দাবনের নাম-মাত্র শ্রবণে প্রভুর মূর্চ্ছা হয়, যাহার ধূলিরেণু পাইলে দুর্লভ জ্ঞানে প্রভু মহানন্দে কালাতিপাত করেন, বহুদিন যাবৎ যে বৃন্দাবনে আসিবার জন্য প্রভু পাগল, আজ সেই বৃন্দাবননাথ বৃন্দাবন আসিলে তথায় যে প্রেমের ঝটিকা প্রবাহিত হইল, তাহা আমার সাধ্য নাই যে, বর্ণনা করি। মুক্তিচ্ছার পরমারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে হৈল যত প্রেমের বিকার।
কোটী গ্রন্থে অসংখ্য লিখে তাহার বিস্তার ॥
তবু লিখিবারে পারে কার এক পণ।
উদ্দেশ করিতে করে দিক দরশন ॥"
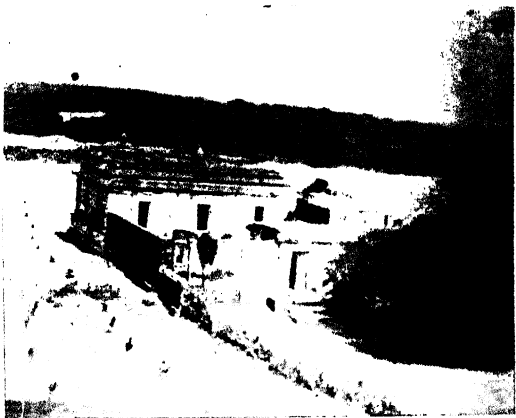
বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় সকলে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় ধনকে আবার প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সকলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় রত হইলেন। বৃক্ষলতাদি মুকুলিত ও মুঞ্জরিত হইল। শুক, পিক, ভৃঙ্গকুল প্রভু দর্শনে অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিল। ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া প্রভুর অগ্রে নৃত্যপূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। গাভীসকল গোপগণের সমচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া উর্দ্ধ-পুচ্ছে প্রভুর নিকট ছুটিয়া আসিল, মৃগকুল ব্যাকুল হইয়া প্রভুর পার্শ্বে চলিতে লাগিল, আর ক্ষণে ক্ষণে শ্রীঅঙ্গের সুবাস পাইয়া প্রভু-অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। এইরূপে স্থাবর জঙ্গম সকলের কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া বৃন্দাবনের প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণে রত হইলেন এবং এই লুপ্তপ্রায় মহাতীর্থের যেখানে যেটী লুপ্তভাবে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিলেন। আজ যে বিশাল পুরীকে আমরা বৃন্দাবন বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত।

পাঠান-উদ্ধার।

বৃন্দাবনে কিছুদিন বাস করিয়া ইচ্ছাময় প্রভু পুনরায় প্রয়াগে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি পাঠানকে কৃষ্ণনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলীখান॥

অল্প বয়স তার প্রভু রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥"

এই ভাগ্যবান্ পাঠানগণ প্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-নাম প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং ইহাঁদের পাঠান গোঁসাই খ্যাতি হইল। এইরূপে প্রভু চলিয়াছেন, আর যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতেছে, সেই কৃষ্ণনামে মত্ত হইতেছে, যথা—

"যেই যেই জন প্রভুর পাইলা দরশন।
সেই সেই প্রেমে মত্ত করে সংকীর্ত্তন॥
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেই মত পশ্চিম দেশে প্রেমে ভাসাইল॥"

এইরূপে পথে হরিনাম-নিধি বিলাইতে বিলাইতে শ্রীপ্রভু প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলে, শ্রীরূপ-গোস্বামী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। রূপসনাতন শ্রীপ্রভুর চরণরেণু লাভ পর্য্যন্ত রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ শ্রীপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া আপনার সমস্ত সম্পদ বৈষ্ণবগণকে বণ্টনপূর্ব্বক প্রভু-মিলনে যাত্রা করেন এবং বহুপথ পর্য্যটন করিয়া প্রয়াগে আসিলে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এখান হইতে শ্রীপ্রভু রূপকে লইয়া কাশীধামে উপনীত হয়েন।

সনাতন, প্রথম বাদসাহের নিকট বিদায় লইতে পারেন নাই, তিনি যখন কর্ম্মত্যাগে কোন উপায়েই বাদসাহের অনুমতি পাইলেন না, তখন

পীড়ার ভান করিয়া গৃহে রহিলেন। এই পীড়ার কথা শ্রবণে বাদসাহের মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি রাজবৈদ্যকে সনাতনের চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। বৈদ্য সনাতনের নির্ব্বাধিশরীর দর্শন করিয়া সমস্ত বিষয় রাজার গোচর করেন, তাহাতে বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। এই সময়ে উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত বাদসাহের যুদ্ধ চলিতেছিল, তাই বাদসাহ সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন, "যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধযাত্রা কর, তাহা হইলে তোমার কারামোচন করিয়া দিই"; কিন্তু ধর্ম্মভীরু কৃষ্ণগতপ্রাণ সনাতন, যে পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিরাজিত আছেন, সেই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে অসম্মত হওয়ায় নবাব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বন্দীপূর্ব্বক কারা প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে সনাতন কারারক্ষীকে বহু অর্থ উৎকোচদানে প্রচ্ছন্নবেশে কারাগৃহ হইতে পলায়নপূর্ব্বক একেবারে কাশীধামে গৌরাঙ্গচরণে মিলিত হয়েন।

প্রকাশানন্দ-বিজয়।

কাশীধাম তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডীগণের রাজ্য এবং প্রকাশানন্দ স্বামী সেই রাজ্যের রাজা; তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা তখন দশসহস্র। আবার এই সহস্র শিষ্যের প্রত্যেকের দুই, চারি, দশটী করিয়া চেলা; সুতরাং প্রকাশানন্দকে তৎকালীন সন্ন্যাসী-শিরোমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সন্ন্যাসীপ্রধান কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুনরাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ নানা ভঙ্গীতে সর্ব্বত্র প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রভুর ভক্তগণের মনে এই নিন্দাবাদে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। কষ্ট এই যে

এতগুলি জীব অকারণ অন্ধকারে ডুবিয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহারা সকলে যুক্তি করিয়া একদিন তাঁহাদেরই একজনের বাটীতে কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সে সভায় তাঁহারা প্রভুকেও আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি এই ছিল যে, একবার মাত্র শ্রীপ্রভুর চন্দ্রবদন দর্শন করিলে ও তাঁহার সহিত মিলন হইলে তাঁহাদের আর সে ভাব কিছুতেই থাকিবে না।

ক্রমে সকল সন্ন্যাসী সমবেত হইলে প্রকাশানন্দ স্বামী আসিয়া সভারোহণ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন শুনিলেন যে, সভায় দশসহস্রের উপরও সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছেন, আর সকলে তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন তখন অতি দীনভাবে সনাতনাদি চারিজনমাত্র সঙ্গী সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলেন। এতাবৎ সন্ন্যাসীগণ প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইলেও কাহারও ভাগ্যে তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তি ঘটে নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী বুঝি তাঁহাদেরই মতন একজন দাম্ভিক পুরুষ, হয় ত তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক দাম্ভিক, তাই যখন তাঁহারা প্রভুর দীনাতিদীন মূর্ত্তি ও সকরুণ দৈন্যবেশ দেখিলেন এবং তাঁহার বিনয়-নম্র-বচন-সুধা পান করিলেন, তখন তাঁহাদের সকলের মনে হইতে লাগিল, এই নিরহঙ্কার দেবদুর্লভ পুরুষটীকে অনর্থক হিংসা করিয়া ভাল কার্য্য হয় নাই। আবার যখন পরমপণ্ডিত প্রভু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে তাঁহাদের সমস্ত কুতর্ক খণ্ডন করিয়া মায়াবাদের অসারত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মত এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব বিচারশক্তি অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুকোমলচরিত্র প্রকাশানন্দও প্রভুর প্রেমভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একেবারে

মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, সেজন্য যখন ভক্ত্যাপ্লুত হৃদয়ে, প্রেমাকুলিত নয়নে প্রভুর দিকে অপূর্ব্বজ্ঞানে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন দেখিলেন, সম্মুখে আর সে দীনমূর্ত্তি কৃষ্ণচৈতন্য নাই, সেস্থানে তাঁহার অভীষ্টদেব স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, তখন প্রেমমুগ্ধ প্রকাশানন্দ ভাবাবেশে প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। এই প্রকাশানন্দই শ্রীপ্রভুর কৃপাকণা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-জগতে ভক্ত-শিরোমণি 'প্রবোধানন্দ' নামে খ্যাত হয়েন। ইঁহার রচিত "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থে প্রভুর রূপগুণাদি এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজন সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটিঃ
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেহম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বী কোটি
গৌরোদেবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥

নীলাচল-আগমন।

এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া এবং প্রবোধানন্দ সনাতনাদিকে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করিয়া শ্রীপ্রভু পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে উপস্থিত হইলে স্বরূপ দামোদর এ সংবাদ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণও পূর্ব্বের ন্যায় শচীমাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রতিবৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। এই যে আজ লক্ষ লক্ষ লোক কত অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া কত কষ্ট সহ্য পূর্ব্বক প্রতিবৎসর শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হইতেছেন, এ সেই নবদ্বীপের সোণার পুতুলেরই ক্রিয়া। আর "প্রসাদান্ন চণ্ডালে

বহন করিলেও অপবিত্র হয় না" - এই যে অপূর্ব্ব প্রসাদ মাহাত্ম্য এও সেই শ্রীপ্রভুরই কৃত।

ব্রহ্ম হরিদাসের সমাধি।

শ্রীপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করার পর ক্রমেই নিশিদিন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া মহাভাবসাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন; এবং জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর প্রেমবিহ্বল অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাঁহার এই মহাভাবসমাধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং প্রভুর লীলাবসানের আভাষ পাইয়া, পাছে সেই নিদারুণ বিরহ সহ্য করিতে হয়, এই আশঙ্কায় এই পার্থিব তনুত্যাগ মানস করিয়া প্রায়োপবেশন করিলেন এবং একমনে সেই পতিতপাবন সর্ব্ব-সুখদ অভয়-চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন সর্ব্বজ্ঞ প্রভু হরিদাসের মনোভিলাষ বুঝিতে পারিয়া ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন; এবং স্বয়ং মধুর কণ্ঠে জগন্মঙ্গল নাম গান করিতে লাগিলেন। হরিদাস এই লোভনীয় অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তের সুযোগ পাইয়া—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখ-পদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আপনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তক-ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রমণ॥

ভক্তগণ হরিদাসকে ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যুকে বরণ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভুও হরিদাসের ত্যক্ত কলেবর অঙ্কে গ্রহণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং তদনন্তর মহামহোৎসবে সেই পূতদেহ অনন্ত জলধির পবিত্রতটে সমাধিস্থ করিলেন। অদ্যাপি সে সমাধি মন্দির ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছে ও তথায় তাঁহার ব্যবহৃত শীমের ঝুলি ও একগাছি যষ্টি সংরক্ষিত আছে।

শিক্ষাষ্টক।

ক্রমে যত দিন গত হইতে লাগিল, শ্রীপ্রভুর প্রেম বৈকল্য ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবান, যাঁহারা শ্রীভগবানের অপার কৃপার কণামাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে যেমন বহির্জগতের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কচিৎ শ্রীভগবানের স্ফুরণ হয়, তেমনি শ্রীপ্রভুর মহাভাবসমাধির মধ্যে অধুনা চকিতের ন্যায় কখনও বহির্জগতের কথা স্মরণ হইত। এই বাহ্যভাবপ্রাপ্তির সময়ে শ্রীপ্রভু কদাচ কাহাকে উপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করিতেন। এইরূপে একদিন তিনি স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দকে আটটী শ্লোক উপদেশ করিলেন। শ্রীমুখের এই আটটী শ্লোক জগতে 'শিক্ষাষ্টক' নামে চিরবিখ্যাত হইয়াছে। যথা চরিতামৃতে ;—

১। চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মা স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্।

যাহা মানস-মুকুরের মালিন্য অপসারণ করে, যাহা সংসার-দাবাগ্নির নিবারণ, যাহা পরম মঙ্গল পথরূপ শ্বেতপদ্মে-প্রতিফলিতশুভ্র জ্যোৎস্না সদৃশ, যাহা পরা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণতুল্য, যাহা শ্রবণে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে, যাহার প্রতিপদে অমৃতাস্বাদ পূর্ণরূপে বিরাজমান, যাহা আত্মাকে ভাবসাগরে স্নান করিয়া অভূতপূর্ব্ব সুখ, দান করে, সেই শ্রীহরি-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

২। নাম্নামকারি বহুধা নিজশক্তিস্তত্রার্পিতানিয়মিতঃস্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশি তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহা জনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবন্! তোমার করুণা এইরূপ যে তোমার নামসমূহে তুমি বহুধা স্বশক্তি নিহিত রাখিয়াছ, এবং সেই সব নাম স্মরণের নিমিত্ত বহু অবসরও দিয়াছ, কিন্তু আমার এমনি দুরাদৃষ্ট যে, সেই নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

৩। তৃণাদপি সুনীয়েন তরোরিব সহিষ্ণুণা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনায়া সদাহরিঃ॥

উত্তম হইয়া নিজেকে তৃণাধম মানিয়া বৃক্ষের ন্যায় সহগুণ আশ্রয় করিয়া আত্মাভিমান্ দূর করতঃ অন্যকে সম্মান দান পূর্ব্বক নিরভিমানে নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

৪। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ! আমি ধন চাহি না, সুন্দরী নারীও প্রার্থনা করি না, কিম্বা কবিত্ব-শক্তি চাহি না, চাহি শুধু জন্মে জন্মে তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি।

৫। অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়॥
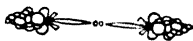
হে নন্দনন্দন! তোমার কিঙ্কর আমি বিষম ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে তুমি তোমার পদধূলির ন্যায় দাস্যে গ্রহণ কর।

৬। নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

হে প্রভো! কবে সে দিন আসিবে, যে দিন তোমার নাম গ্রহণ করিতে আমার নেত্র দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইবে, মুখে বচন রুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং পুলকোদ্গমে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।

৭। যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে॥

গোবিন্দ-বিরহে নিমেষকালও আমার পক্ষে যুগবৎ বোধ হয়, নেত্র দিয়া প্রাবৃট্‌কালীন বারিধারার ন্যায় অশ্রু বিগলিত হইতে থাকে এবং সমস্ত জগৎ যেন শূন্য জ্ঞান করি।

৮। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

হে সখে! সেই শ্রীহরি আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চরণরতা কিঙ্করীই করুন্ বা মহাকষ্টে নিপতিত করিয়া নিষ্পেষিতাই করুন অথবা অদর্শন দিয়া মর্ম্মাহতা করুন কিম্বা যথেচ্ছা বিহারই করুন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহই নহে।

প্রেম-বিকার।

এ অবস্থাও অধিক দিন রহিল না। প্রেমোন্মাদ-অবস্থা ক্রমেই অধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীপ্রভু আর প্রায় কাহারও সহিত বাক্যালাপ

করিতেন না। এই সময়ে তাঁহার প্রেম-বিকার-জনিত নানা প্রকার অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব স্বাত্বিক ভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণ একদিন প্রভুকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জগন্নাথের সিংহদ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীপ্রভু বাহ্যজ্ঞানবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়াছেন। শরীর নিস্পন্দ—নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণমাত্রও অনুভূত হইতেছেনা—হস্তপদাদির সমুদয় গ্রন্থি বিছিন্ন হওয়ায় শরীর অত্যন্ত দীঘল হইয়াছে—কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণ নাম কহে ভক্তগণ লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিল!
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিল॥

আর একদিন সমুদ্র-স্নানে যাইতে দূর হইতে চটক পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া গোবর্দ্ধন জ্ঞানে ঐ বালুময় স্তূপের দিকে ছুটিতে লাগিলেন, তাঁহার অনুচর গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাতে প্রাণপণে দৌড়িয়াও তাঁহার নাগাইল পাইলেন না। কিন্তু শ্রীপ্রভু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ভাবাতিশয্যে শীঘ্রই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তখন সমাগত ভক্তগণের হরিধ্বনিতে তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান-প্রাপ্তি ঘটিলে সকলে মহানন্দে সমুদ্রে স্নান করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

অপর এক দিবস আচম্বিতে কৃষ্ণবেণুগান শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে শ্রীপ্রভু দক্ষিণ সিংহদ্বারে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন, প্রভুর সেই সুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুষ্মাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। [illegible] পদাদি যাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন [illegible] মিলিয়া সেই বরবপু বহন করিয়া গৃহে আনিলেন! আর—

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥

অপর এক নিশিতে প্রভুর প্রেমোন্মাদ সাতিশয় বর্দ্ধিত হওয়ায়, চন্দ্র-রশ্মি-বিভাসিত, চাকচিকাময়, তরঙ্গায়িত, সুনীল পয়োধিবক্ষ দর্শনে হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের জলকেলী স্ফূর্ত্তি হওয়ায় যমুনা-ভ্রমে তিনি সমুদ্র-বক্ষে ঝম্প প্রদান করেন। এদিন ভক্তগণ বহু অনুসন্ধানেও যখন প্রভুর কোনও সংবাদ পাইলেন না, তখন প্রভু বুঝি অন্তর্দ্ধান করিলেন, এই মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই সময়ে স্বরূপ দামোদর একজন ধীবরকে হরিধ্বনি করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে দেখিয়া সন্নিহান হইয়া ঐ ধীবরকে শ্রীপ্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"কহ জালিয়া ঐ দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ॥
জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হইল।
স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শন-মাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায়॥"

ভাগ্যবান জালিয়া যখন এইরূপে প্রভুর স্বরূপ বর্ণন করিলেন, তখন,

ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে যাইয়া দেখিলেন, সেই কমলাসেবিত "পুরট সুন্দর দ্যুতী কদম্ব সন্দীপীত" শ্রীঅঙ্গ —

"ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়;
অতি দীঘ শিথিল তনু চর্ম্ম লটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আননে না চায়॥"

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর সেবায় রত হইলেন; কেহ আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দিলেন, কেহ শ্রীঅঙ্গের বালুকা-কণা ছাড়াইতে লাগিলেন; কেহ কেহ বহির্ব্বাস পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে সেই শয্যায় শায়িত করিলেন এবং তখন সকলে মিলিয়া উচ্চ হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"কতক্ষণে প্রভু-কানে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবেত উঠিল॥"

ভাব-সমাধি।

উপর্য্যুপরি প্রভুর এইরূপ প্রেম-বিকার ও মহাভাবসমাধি অবলোকন করিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন! সকলের মনে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে, আর বুঝি তাঁহারা তাঁহাদের প্রেম শৃঙ্খলে প্রভুকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। কিন্তু এই মর্ম্মগ্রন্থিছিন্নকারী নিদারুণ কথা মনে হইলেও কেহ মুখে আনিতে পারিলেন না। সুতরাং সকলেই আপনি আপনি বুঝিয়া সতর্কে প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের এই প্রেমপূর্ণ সযত্ন অনুরোধে কোনও ফল হইল না। কেননা ইচ্ছাময়

লীলাময় প্রভু যে মহোৎকার্য্য সাধন করিতে গোলোক ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যের আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মহান কার্য্য অর্থাৎ "জীবে দয়া—নামে রুচি" আত্মচরিত্রে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দেওয়া—সম্পন্ন হইয়াছিল ; সুতরাং সেই ভক্তাবতার প্রভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমলীলার অবসান নিকট হইয়া আসিয়াছিল।

লীলাবসান।

একদিন ভগবানকে লইয়া বৃন্দাবন-লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া দ্রুতপদে জগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। প্রভু দ্রুতগমনে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মন্দিরদ্বার আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। বাটীর অভ্যন্তরে ভোগ-মন্দির প্রভৃতি স্থানে দু এক জন জগন্নাথের সেবক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রভুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া দ্রুত আসিয়া দ্বার মোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কেহই আর প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন সকলে প্রভুর অন্তর্দ্ধান বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই মহা শোকের বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দির শোকাকুল ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে এই নিদারুণ সংবাদ ভারতবর্ষীয় যাবতীয় ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে যে মহা শোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

মহাপ্রভুর অসহ্য বিচ্ছেদে যে সকল ভক্ত নিতান্ত কাতর হইয়া

পড়িয়াছিলেন, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাদের মধ্যে এক জন। তিনি এই নিদারুণ ঘটনার পর হইতে নিত্যকর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া একরূপ অনাহার অনিদ্রায় নিতান্ত শোকাকুলচিত্তে গোপীনাথমন্দিরে ভূমিশয্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে কৃপাময় প্রভু প্রাণপ্রিয় ভক্ত গদাধরের এই শোচনীয় অবস্থায় বিচলিত হইয়া স্বধাম হইতে আসিয়া গদাধরকে চকিতের ন্যায় দর্শন দিয়া গোপীনাথ-অঙ্গে মিলাইয়া যান। ভাগ্যবান পাঠক ইচ্ছা করিলে গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে এই গৌরগোপীনাথ মিলন অদ্যাপি দেখিতে পারেন। শ্রীঅঙ্গের সেই অলৌকিক কনকরেখা অদ্যাপি ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস আনিয়া দেয়।

এইরূপে ১৪৫৫ শকে এই অপূর্ব্ব দেবলীলার অবসান হয়। এই অমিয় চরিত কনকপুত্তলী প্রেমের মূর্ত্তি দেব-শিশুটী ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট কাঞ্চননগরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ক্রমিক ছয় বৎসর ভারতের সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক, জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অপ্রকট হয়েন। এই অলৌকিক অপূর্ব্ব পূতজীবনে যে সুগভীর প্রেম, অনন্ত ভাব-সমাবেশ ও অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা সুবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমরা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সেই মহান্ চরিত্রের আভাষমাত্র দিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যে মধুর হইতে সুমধুর পবিত্রকাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণনা করিলেও কিছুই বলা হয় না। যাঁহার এক এক দিনের জীবনী-কথা লইয়া বিচার ও ভাবনা করিলে এক এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে, সেই মহান্ পুরুষের মহান্ চরিত্রকে এই স্বল্প কয়েক

পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র! তবে তাঁহার কাহিনী লিখিতে ও তাঁহার স্মরণ ও চিন্তা করিতে হইবে, এই লোভেই আমার এই হাস্যকর উদ্যম।

আয়ুরূপ যে পথে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিয়া ছিলাম, তাহার ত বহু পথই অতিক্রম করিলাম, এখনও ত সেই বাঞ্ছিত ধামে যাইবার কোনও সম্বলই সংগ্রহ হইল না। সম্বলহীন হইয়া কেমন করিয়া কোন্ ভরসায় সে পথে অগ্রসর হই। সে শক্তি সামর্থ্য নাই যে,ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া কিছু সম্বল করিয়া লই। সংসারবিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণের সুকুমার বৃত্তিনিচয় সকলই ত শুষ্কপ্রায়; তবে কি করিয়া সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত ধনলাভে সমর্থ হইব? সেজন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া ঋণ লওয়াই স্থির করিয়া মহাজনের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু কে এমন মহাজন আছে যে, আমার ন্যায় সম্বলহীন কাঙ্গালকে ঋণ দান করিবে? এ ত ঋণ দেওয়া নহে, এ যে ঋণের নামে চিরদিনের মতন দান; এমন দাতা কোথায় পাই? কাজেই এখানে ওখানে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক মহাপুরুষের নিকট সন্ধান পাইলাম যে, আমারই গৃহদ্বারে এক শক্তিধর দয়াল ঠাকুর আছেন, যিনি, অবিচারে পতিত, অধম, কাঙ্গাল দুর্জ্জন সকলকেই যাচিয়া যাচিয়া, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহাই দেন। সে ঋণ পরিশোধ করিতে হয় না, সে ঋণে দায়গ্রস্ত হইতে হয় না, সেজন্য সে দাতা কেমন, জানিবার জন্য তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এ পুস্তকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র, পতিত, অধম, কাঙ্গাল যদি কেহ থাকেন, তাঁহারা এই দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করুন, দেখিবেন, সে পথের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্বল হস্তগত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার গ্রহণ সম্পর্কীয় শাস্ত্রী প্রমাণ সম্বন্ধে মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরা ভবিষ্যপুরাণ, গারুড়ে, কাপিল তন্ত্রে, নারদীয়ে, ব্রহ্মযামলে, বৃহৎব্রহ্মযামলে এবং বিশ্বসার প্রভৃতি অসংখ্য পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এবং ভক্তিশাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানাভাব বশতঃ কয়েকটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণম"

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৯ অঃ ৭৫শ্লোক

"স্বর্ণবর্ণোহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী"

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৯ অঃ ৯২ শ্লোক।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে সর্গ বাক্যং, ৮ অঃ ১৩ শ্লোক।

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃকলৌ যদভব স্ত্রিযুগোহথ স্বতং"

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে শ্রীনৃসিংহ স্তবে, ৯ অঃ, ৩৮ শ্লোক।

"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ, ৫ অঃ, ৩১।৩২ শ্লোক।

তোমারই কর্ম্ম প্রভু তোমতেই অর্পণ।

সমাপ্ত।

Printed by A. T. Ghosal, at the Banik Press, Calcutta.